ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

আই এস ও ৯০০১ : সনদপ্রাপ্ত

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১/ আশ্বিন ১৪০৮

সম্পাদনা পরিষদ

মোশারফ হোসেন
সৈয়দ শামসুল আলম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১ / আশ্বিন ১৪০৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্নাল

সম্পাদক ঃ এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৮

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
মূল্য	ঃ	১৮০ টাকা US$ 10
মুদ্রণে	ঃ	ওসমানিয়া প্রেস ৮ ওয়্যার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।

LOKPROSHASON SAMOEEKY

Vol. 20, September 2001 / Asshin 1408

Quarterly Journal of

Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : S. M. Zobayer Enamul Karim

© Bangladesh Public Administration Training Centre 1408

Telephone	:	7710010-16 (PABX)
Fax	:	7710029
E-mail	:	bpatc@bangla.net
BPATC Library	:	351.0005

লোক প্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১/ আশ্বিন ১৪০৮

সূচিপত্র

পরিবেশ ও সভ্যতার সঙ্কট ঃ একটি নৈতিক পর্যালোচনা ১
মোহাম্মদ কামরুল আহসান
এ, এস, এম, আনোয়ারুল্লাহ ভূইয়া

বাংলার সমাজ ব্যবস্থা নিরীক্ষণে নজরুল ৩১
মোঃ মাহমুদ হাসান

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ঃ ধারণাগত বিভিন্নতা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ৫৭
মোঃ রিয়াজুল হক

সিভিল সার্ভিস, প্রশাসনের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ৮৫
গাজী মিজানুর রহমান

জাতীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সমীক্ষা ৯১
কে, এম, মহিউদ্দিন
মোজাম্মেল হক

অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প নির্বাচন ঃ ধারণা ও কৌশল ১০৯
এস, জে, আনোয়ার জাহিদ

Privatization of State Owned Enterprises (SOEs) in Bangladesh (1975-1999) : Background, Concepts, Progress of Implementation, Case Studies and Issues ১২৩
S. M. Zobayer Enamul Karim

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা ও অবস্থান— একটি মাঠ পর্যায় অনুশীলন ১৭৩
বেগম রোকসানা মিলি

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

পরিবেশ ও সভ্যতার সঙ্কট ঃ একটি নৈতিক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ কামরুল আহসান*
এ, এস, এম, আনোয়ারুল্লাহ ভূইয়া**

Conflict of Environment and Civilization : A Moral Review

Mohammad Quamrul Ahsan
A. S. M. Anowarullah Bhuiyan

Abstract: Interactions between man and environment is extensive and it is a must for human survival on earth including all living organisms. But human use of nature has been so large and sophisticated due to the tremendous advancement in science and technology . This sort of human activities and understanding put some significant adverse impacts on the environment. Current researches on environment crisis have proved that each sweeping of the modern science affect not only lives and ecosystem but also civilization that have made by humans on earth through out the last thousands of years. And trouble with civilization is a threat to both existing and future generation of human beings. However, we can well face the crisis of our civilization that is made by us, through changing our present behavior pattern with nature in accidence with direction of the spirit of modality and world religion's common view i.e. solidarity. Besides sustainable development and the opinions of experts in this area are also equally important and essential for achieving the same goal.

---

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
** প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বে কৃত্রিম পন্থায় ভূ-প্রকৃতি তথা পরিবেশকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করা হচ্ছে। ফলে জীব বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। নিঃশেষ-প্রায় ভূ-গর্ভের সম্পদ, বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্পপণ্য আর রাসায়নিক দ্রব্যের সম্ভার। একমাত্র সত্য যে, প্রকৃতি তার গর্ভগৃহে এগুলি তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। প্রকৃতির এই মজুদকৃত সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, সাম্রাজ্য আর বাণিজ্যের সৌধ। ফলতঃ নিঃশেষ হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে রাসায়নিক বিজ্ঞানের। সম্পদ ফুরিয়ে মানুষের কৃত্রিম নির্ভরতা ক্রমশ বেড়েই চলছে। এই নির্ভরতা একদিকে যেমন পরিবেশকে দূষিত করছে অন্যদিকে সভ্যতার সঙ্কটকেও বর্ধিত করে তুলছে। এসব পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালে পরিবেশবিদ্যা নতুন এক সভ্যতার রূপরেখার প্রস্তাব করছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য টেকসই উন্নয়ন এবং নৈতিকতার গুরুত্ব কতোটা ভূমিকা রাখতে পারে তারই সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব।

পরিবেশ সঙ্কট

মানুষের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষ কোন না কোনভাবে জীবন ও ভৌত পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের নিরাপদ জীবন প্রবাহ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আন্তক্রিয়ার ভারসাম্যের উপর। খুব সহজ করে বলা যায় - মানুষ তার খাদ্যের জন্য মাটি, পানি, বায়ু ,উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনোবা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল । মানুষের সঙ্গে পরিবেশের এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সাধারণ খাদ্য শৃঙ্খলকে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল উল্লেখপূর্বক দেখানো যেতে পারে পরিবেশ বা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড়। উপরোক্ত খাদ্যশৃঙ্খলে উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর আন্তসর্ম্পক শক্তির প্রবাহের মাত্রানুযায়ী আমরা তৃণভোজী জীব, মাংসাসী জীবের সঙ্গে যে সম্পর্ক রয়েছে তা দেখাতে পারি।
প্রাণী হিসেবে মানুষের পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা অবিচ্ছেদ্য। খাদ্য শৃঙ্খলের দিক থেকে, শক্তি ও তাপ অর্জনের দিক থেকে এবং বস্ত

সংস্থানগত দিক থেকে পরিবেশের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা অনিবার্য। পরিবেশের উপর মানুষের এই নির্ভরশীলতার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়দায়িত্ব আমাদের নিজস্ব প্রাণ সংরক্ষণের দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। কিন্তু আমাদের জীবনকে সুখময় এবং সহজসাধ্য করার জন্য পরিবেশকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করে চলছি। যা আমাদের তাৎক্ষণিক সুখ নিশ্চিত করলেও আমাদের বসবাসকারী ভূমণ্ডলকে বসবাস অনুপযোগী করে তুলছে। তার-ই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল–

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব ঃ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত এমনকিছু খাদ্য সংযোজন বস্তু, সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান এবং কীটপতঙ্গ নাশক ব্যবহার করি যা পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর। নিম্নের চার্টগুলি লক্ষ্য করা যাক

ছক-১

টক্সিন পদার্থ	ক্ষণস্থায়ী প্রভাব	দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দূষিত বায়ু		√
সিগেরেটের ধোঁয়া	√	√
কীটনাশক	মাথাধরা, হাল্কা কাশি	দেহে প্রবল আক্ষেপ সৃষ্টি হয়

ছক-২

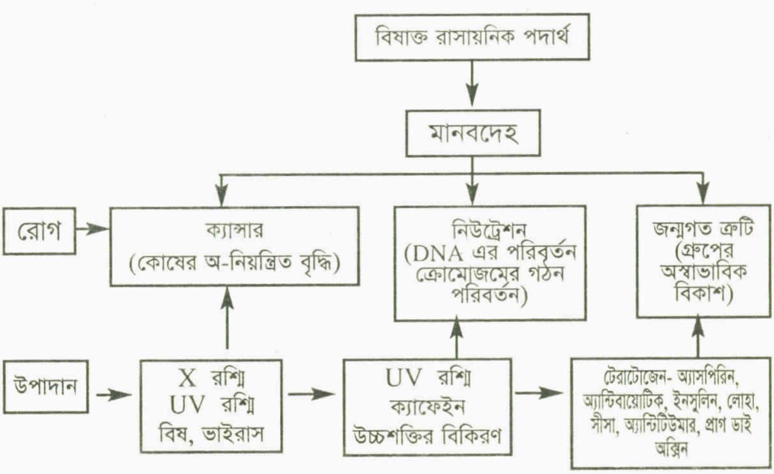

সংস্থানগত দিক থেকে পরিবেশের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা অনিবার্য। পরিবেশের উপর মানুষের এই নির্ভরশীলতার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়দায়িত্ব আমাদের নিজস্ব প্রাণ সংরক্ষণের দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। কিন্তু আমাদের জীবনকে সুখময় এবং সহজসাধ্য করার জন্য পরিবেশকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করে চলছি। যা আমাদের তাৎক্ষণিক সুখ নিশ্চিত করলেও আমাদের বসবাসকারী ভূমণ্ডলকে বসবাস অনুপযোগী করে তুলছে। তার-ই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল–

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব ঃ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত এমনকিছু খাদ্য সংযোজন বস্তু, সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান এবং কীটপতঙ্গ নাশক ব্যবহার করি যা পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর। নিম্নের চার্টগুলি লক্ষ্য করা যাক

ছক-১

টক্সিন পদার্থ	ক্ষণস্থায়ী প্রভাব	দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দূষিত বায়ু		√
সিগেরেটের ধোঁয়া	√	√
কীটনাশক	মাথাধরা, হাল্কা কাশি	দেহে প্রবল আক্ষেপ সৃষ্টি হয়

ছক-২

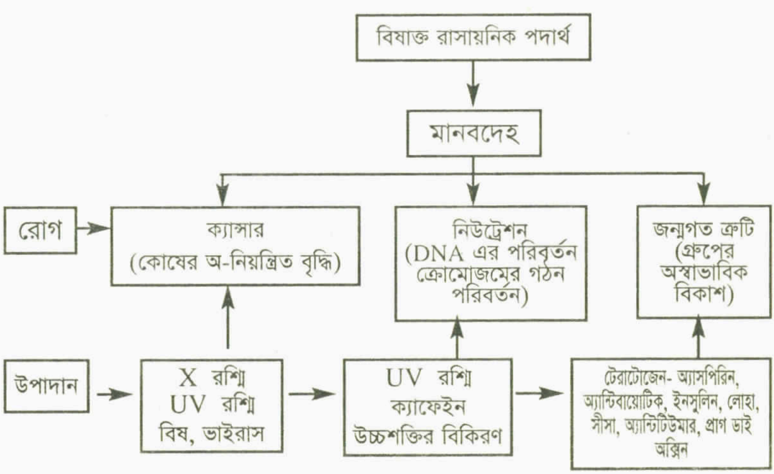

ছক-৩

মানুষের উপর Food Additives এর প্রভাব -

খাদ্যের নাম	অপমিশ্রিত উপাদান	প্রভাব
মিঠাই, আইসক্রীম বেসন মাখন চিনি মশলা	অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মেটানিল ইয়ালো স্যাকারিন (টেট্রোলিয়াম জাত) খেসারীর গুড়া (জৈব যৌগ B-N-Oxayl , সাকারিন চক পাউডার অ্যারো কোলিন	এসব উপাদান সব রকম টক্সিক উপাদান হিসেবে বিবেচ্য, খাদ্যের এসব উপাদান অনেকক্ষেত্রেই শরীরে বিভিন্ন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- পঙ্গুত্ব, হৃদরোগ,
সন্দেশ (ভোজ্য তৈল)	অ্যালুমিনিয়াম পাত রোডমিল বি ট্রাই-অর্গে-ক্রিসাইল ফসফেট	

পেস্টিসাইডের প্রভাব

	রাসায়নিক উপাদান	ক্রিয়ার প্রভাব
ক. **ইনসেক্টিসাইড ঃ**	ডিডিটি	ডিডিটি ব্যবহার ঃ ১. বিভিন্ন পশুপাখির জনন অক্ষমতা সৃষ্টি করে থাকে ২. জলে অদ্রাব্য। ফলে ডেট্রিক্স ও ডিকম্পোজার খাদ্যশৃঙ্খলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। ৩. Bio-activation থাকার কারণে ডিডিটি সহজে চর্বি ও অন্যান্য কোষে প্রবেশ করে। ৪. ডিডিটির বিষক্রিয়ায় মৃত্যু না হলেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। কোষীয় শৈথিল্য, নিউরোনের

	অপ্রজনন, স্নায়বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।
টক্সফিন ঃ	১. মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে অধিকতর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। ২. প্রাণীর দেহে সম্পৃক্ত হয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। ৩. দৌর্বল্য, স্নায়বিক বিকার, বমি ভাব, মাথা ধরার সৃষ্টি করে থাকে।
অলড্রিন, ডায়েলড্রিন এন্ডিনঃ	১. মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া, স্নায়বিক বিকার, পেটের যন্ত্রণা, মাথাঘোরা সৃষ্টি করে থাকে। ২. ঈগল, হাঁস ও মুরগীর বংশবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে।
ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর ঃ	১. যকৃৎ, বৃক্ক ও ফসুফুসে বিষক্রিয়ার সৃস্টি করে। ২. এ রাসায়নিক শিল্পে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের নিউকিমিয়া হয়ে থাকে।
ডাইক্লোরফোম, প্যারনিয়ন, ম্যালথিয়ান ঃ	মাছি, মশা ও অন্যান্য পতঙ্গ ধ্বংস করতে এই রাসায়নিক উপাদনগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিবেশের প্রভাব ঃ ১. মানসিক বিকার ও অ্যামনিয়ায় ঘটে থাকে। ২. গর্ভপাত ঘটে থাকে।

		৩. বমি ও ডায়েরিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ৪. দৃষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে।
খ. **হার্বিসাইড**	অ্যাট্রাজিন ঃ	পানি দূষণ করে থাকে
	মেটোলাক্লোর ঃ	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে ফুসফুস ক্ষতের সৃষ্টি করে।
	ডাইঅক্সিন ঃ	এর লিপিড় দ্রাব্যতার কারণে ডাই-অক্সিন অতি সহজে খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে মানুষের স্বাস্থ্য হানি ঘটিয়ে থাকে।

উল্লিখিত মানবসৃষ্ট রাসায়নিক দূষণগুলোর পাশাপাশি মানবকর্তৃক বায়ূ-দূষণের প্রভাব ও সভ্যতার যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত ও নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখিন করে তুলেছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে যতটা না বায়ুকে দূষিত করা হচ্ছে - তার থেকে বেশি পরিমাণে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু দূষণ করা হচ্ছে। নিম্নের চার্টে বায়ুদূষণের বিভিন্ন উৎস, দূষক পদার্থ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব দেখানো হল -

বায়ু দূষণের উৎস ও দূষক:

ছক-৪

উৎস	দূষক
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কলকারখানা শিল্প প্রক্রিয়া করণ রেফ্রিজারেটর কয়লা, গ্যাস, কেরোসিন পরিবহণ শিল্প	Sox, Nox, Co, Cos, N_2S, NH_3, No, So_3, HF, Sr-90, CS-134, অ্যারোসল, O_3, Cl, ক্রেরণ,

প্রভাব ঃ	
Sox →	শ্বাসনালীর স্ফীতি, অ্যাজমা, নাসিকার জ্বালা সৃষ্টি করে, ব্রঙ্কাইটিস
Co →	মাথাধরা, ঝিমুনি, দৈহিক সামর্থ্য হ্রাস করে।
No →	ব্রঙ্কাইটিস

শিল্প কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থ, পেস্টিসাইড ও আর্সেনিকের ক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বের আরেকটি উপাদান জলকে দূষিত করে যাচ্ছে। ফলে আমাদের ব্যবহার উপযোগী পানির পরিমাণ ও জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। ফলতঃ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ভূ-বৈচিত্র্য। এভাবে প্রাণী ও মানুষের উপর জলজ দূষণ কু-প্রভাব ফেলছে। ফলে মানুষ যেমন, বিষক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, একইভাবে জলজ প্রাণীসমূহের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে যা আমাদের প্রোটিন ও পুষ্টির ঘাটতি ঘটাচ্ছে।

সভ্যতার সঙ্কট

স্থূল প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ থেকে মানুষ তার পরিবেশ ও প্রতিকুলতাকে জয় করে জীবনযাত্রাকে একটি মাত্রায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়। আর এভাবে মানুষ যখন নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্যাদি এবং নিজস্ব মূল্যবোধকে নির্মাণ করে একটি সাধারণ ঐতিহ্যকে প্রবাহিত করতে প্রয়াসী হয় তখন তাকে আমরা সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করে থাকি (আলম,২০০১,২-৩)। সভ্যতার এই ধারাবাহিকতায় মানুষ নিজেকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে পৌছাঁয় যখন মানুষ প্রকৃতিকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং একটি উচ্চতর জটিল সাংস্কৃতিক প্যাটার্ণ নির্মাণ করতে সক্ষম হয। কিন্তু সভ্যতা বিনির্মাণের মূল চালিকাশক্তি হল– উর্বর পুষ্টিযোগ্য ভুমি, অনুকূল জলবায়ূ, উত্তম পোতাশ্রয় এবং প্রচুর পরিমাণের খসিজ সম্পদ। অর্থাৎ সভ্যতার বিকাশে একটি উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন যা দূষণযুক্ত, ভারসাম্যহীন ও বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠে না। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে মানব-সৃষ্ট বিভিন্ন যন্ত্র-কৌশল আগামী দিনের সভ্যতাকে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সঙ্গত কারণে এভাবে বিপর্যস্ত

হচ্ছে পরিবেশ, বিলুপ্ত হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রাণীকূল। জীবীয় (biotic) কিংবা অজীবীয় (abiotic) উপদানের উপর মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্ভরশীলতা অনস্বীকার্য। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনসমূহ মিটাবার তাগিদে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করছি বিভিন্নভাবে। অনেকক্ষেত্রেই আমরা ভুলে যাই যে মানুষ ও সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়ার উপর। সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা একে আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যস্ততা, শিল্প কলকারখানার লাগামহীন বিকাশ পরিবেশের উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের বাজার দখলের একচেটিয়া মানসিকতার উপর ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে, বর্জ্য ও বিষাক্ত আবর্জনা ভূ-পৃষ্ঠ তথা নদ-নদী ও সাগরের পানিকে বিষিয়ে তুলছে। ফলতঃ পরিবেশের উপর নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেই প্রভাব অন্য অর্থে মানব-সভ্যতাও আক্রান্ত হচ্ছে।

সভ্যতার ভবিষ্যত

সভ্যতার বিকাশের নামে আমরা মূলত আগামী দিনের সভ্যতার সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করছি। পারমাণবিক শক্তি তথা মহাকাশচারণবিদ্যা আমাদের সাম্প্রতিক সভ্যতার নিদর্শন হলেও তা মুলত আগমী দিনের পৃথিবীকে বসবাস অনুপযোগী করে তুলছে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কিভাবে মানবজাতি ও জীবমণ্ডলের উপর দানবীয় আঘাত হানার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে—হিরোশিমা ও নাগাসাকিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন বিজ্ঞানী তাই অপরাধের শোচনীয় ফলাফলে আতঙ্কিত হয়ে বলেন, জ্ঞানান্বেষণের সনাতন পন্থায় আমূল পরিবর্তন আসছে। কারণ বিজ্ঞান যেখানে মানুষকে কল্যাণ ও সত্যের পথ প্রশস্ত করবে সেখানে বিজ্ঞানের অপতৎপরতায় মহাশক্তিধর হবার ভুমিকায় অবতীর্ণ হবার প্রতিযোগিতায় অনেকেই আমরা নামছি। মহাশূন্যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ, সমর প্রতিযোগিতা কিংবা পারমাণবিক পরীক্ষা ইত্যাদি হল আধুনিক বিজ্ঞানের নেতিবাচক ফলাফল।

উন্নত সমাজ ও মহাশক্তিধর হবার মানসিকতায় যখন মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে শুরু করলো সেই থেকে বিজ্ঞান মানব উন্নয়ন অপেক্ষা পরিবেশ সমস্যা ও সভ্যতার সঙ্কটকে প্রকট আরো করে তুলছে। এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করা যায়—১৯৬২ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০০ কি. মি. উপরে একটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীর চারপাশে তীব্র বিকিরণের একটি বলয় গড়ে উঠে। এই বিকিরণ বিভিন্ন গবেষণায় পাঠানো অধিকাংশ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে বিকল করে দেয়, রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং মহাকাশ পরিক্রমায় তেজস্ক্রিয়া বিকিরণের বিপদ বাড়িয়ে তোলে। ১৯৬৩ সালের মে মাসে আমেরিকা মহাশূন্যে দ্বিতীয় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। যার ফলে সাড়ে তিনহাজার কি. মি. উচ্চতায় পৃথিবী বেষ্টনকারী মহাকাশে ৪০০ মিলিয়ন তামার সূচের একটি বলয় সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষায় সামান্য বিস্তার রেডিও ও অপটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমির কাজে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে (Ursul, 1983, 120)। এভাবে পরীক্ষার নামে কিংবা রাষ্ট্রীয় বা জাতিগত প্রতিযোগিতার নামে আমাদের পরিবেশ তথা সভ্যতাকে বিপজ্জনক অবস্থার মুখোমুখি করে দিচ্ছি। পারমাণবিক বিস্ফোরণ পৃথিবী নামক গ্রহের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রাণঘাতি তেজস্ক্রিয় কণিকা। ব্যারি কমোনার এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রতিটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ সজীব বস্তুতে, বিশুদ্ধ পরিবেশে তেজস্ক্রিয় কণা ঢুকিয়ে দেয় (Caumoneur,Bary, 1972,53)।

রেডিও বায়োলজিস্ট ও জেনেটিসিস্টদের এক গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে যে তেজস্ক্রিয় কণার ভাঙ্গনজনিত সামান্যতম বিকিরণ বহু জীবের, বিশেষ করে মানুষের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকারক। তেজস্ক্রিয় দূষণ জিনের যে ক্ষতি করে তার ফলাফল প্রকাশ পেতে ১৫-২০ বছর সময় লাগে। বিজ্ঞানীরা এটাও প্রমাণ করেছেন যে, পরিবেশের যেকোন দূষণ অপেক্ষা জীবদেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থের মজুদ শতসহস্র গুণ বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। এর ফলে মনুষ্য প্রজাতির যে ক্ষতি হয় সেটা প্রথম এমনকি দ্বিতীয়, তৃতীয় তথা চতুর্থ প্রজন্মের মধ্যে দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে, পঞ্চম প্রজন্মে গিয়ে সেটা ধরা পড়তে পারে। তাছাড়া আজকের দিনে কৃষিতে, খাদ্য উৎপাদনে কিংবা নিজ

ব্যবহার্য উপকরণাদিতে পারদ, ক্যার্ডমিয়াম, সীসা, রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করছি মানবদেহে গুপ্ত অবস্থায় তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে কিংবা বংশানুক্রমিকভাবে মানুষের রক্ত ও মস্তিস্কের গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, মানুষের চিন্তাশক্তি হ্রাস পেতে পারে। কিংবা এসব রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া মানুষকে বিকারগ্রস্ত, চিত্ত-দৌর্বল্য, উদভ্রান্ত, মানসিক বৈকল্য, ইত্যাদি নানাধরনের শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। শরীরের এসব সমস্যার কারণে মানুষের মধ্য থেকে লোপ পেতে পারে সহনশীলতা, সহানুভূতি। একই উৎকণ্ঠা নিয়ে রুশ পরিবেশ বিজ্ঞানী স্তেপানস্কি বলেন, মানুষের উপর রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রভাবের ফলে বহু পরিবর্তন ঘটছে তার মানসিক অবস্থার, বঞ্চিত করছে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনী ক্ষমতা ও প্রধান সামাজিক ভূমিকা থেকে। মানুষের উপর রাসায়নিক পরিবেশের প্রভাবের ফলে তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য কখনো সমাজ বিরোধী চরিত্রে রূপ পায়। কিংবা শারীরিকভাবে হয়ে উঠে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, মেধাগত দিক থেকে হয়ে থাকে স্থূল ও নির্বোধ - যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের জন্য কোন সহায়কশক্তি তো নয়ই, বরং বোঝাস্বরূপ (স্তেপানস্কি, ১৯৭৩, ৩:৬৯)।

সভ্যতার বিকাশে মানুষের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের আবিষ্কার আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সভ্যতার এসব আবিষ্কারসমূহের ভুল-ভ্রান্তি প্রকৃতিতে, জীবদেহে ও সামাজিক কাঠামোতে নিয়ে আসতে পারে অভাবনীয় ক্ষতি। সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের সভ্যতাকে যতটা না সামনে নিয়ে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি আক্রান্ত করছে আমাদের বসবাস উপযোগী পরিবেশকে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে সৃষ্টি করছে সঙ্কট।

পরিবেশ ও সভ্যতাকে তার অনিবার্য সঙ্কটের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নিরন্তর প্রচেষ্টাও রয়েছে। ১৯৫৫ সালের ৯ জুলাই 'আইনস্টাইন, রাসেল ম্যানিফেস্টো' তে পরিবেশ ও সভ্যতা সংরক্ষণে বিজ্ঞানীদের দায়-দায়িত্বের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁরাই প্রথম ভেবেছিলেন পৃথিবীতে সভ্যতা ও প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে

'নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে' - মানবজাতির প্রতি তাঁদের এই আবেদনের গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয় ম্যানিফেস্টোর ভাষায় -

> "মানবজাতি যে শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন, তাতে আমরা অনুভব করি যে বিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলনে সমবেত হওয়া প্রয়োজন। যাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভবজনিত বিপদের মূল্যায়ন করা যায় এবং সংযোজিত খসড়া দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়। এই উপলক্ষ্যে আমরা কোনো একটি জাতি, মহাদেশ কিংবা ধর্মমতের মানুষ হিসেবে কথা বলছি না, কথা বলছি মানুষ হিসেবে, মনুষ্য প্রজাতির সদস্য হিসেবে। যার এতদিনকার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।" (ম্যানিফেস্টো, ১৯৫৫)

কিন্তু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের এই আহ্বান উপেক্ষা করে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় বছরে প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনাগত প্রজন্মকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিষে বিষাক্ত করে তুলেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং, যারা অর্থ দিয়ে এসব মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করছেন, শুধু তারাই নয় বরং বিজ্ঞানীদের বুঝতে হবে তাঁদের উদ্ভাবিত কৌশলের মারাত্মক ফলাফল জনস্বাস্থ্য ও জীবমন্ডলের জন্য কতটা বিপজ্জনক। সভ্যতা ও পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিজ্ঞানীদের সামাজিক পরিবেশগত দায়দায়িত্ব পালনের প্রথম সাংগঠনিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৫ সালে জুলাইয়ে 'বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্ব ফেডারেশন' এর উদ্যোগে আয়োজিত পারমানবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণে আগ্রহী বিজ্ঞানীদের আলোচনাচক্রে, সেখান থেকে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আহ্বান জানান হয়,

> "বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের চেতনায় নতুন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরমাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণের জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রয়াসের কর্তব্য গ্রহণ করছি এবং এই আশা ব্যক্ত করছি যে ঐ একই উদ্দেশ্যে কর্মরত সকল আন্দোলন এই চূড়ান্ত লক্ষ্যের অনুসরণে ঐক্যবদ্ধ হবে ও একইসঙ্গে কাজ

করবে ... পরমাণু অস্ত্রের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে সবাই পরিচালিত হবে (WFCS,১৯৬৩, ৫)।"

বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায় দায়িত্ববোধের আরো দৃঢ় বক্তব্য লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৫ সালে ২২তম পাগওয়াশ সম্মেলনের 'বিজ্ঞান ও নীতিবোধ' আলোচনায়। পরিবেশ ও সভ্যতার সঙ্কট নিরসনে বিজ্ঞানীদের ভূমিকার গুরুত্ব আরো অর্থবহ হয়ে উঠে এই ঘোষণায়। অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীরা বলেন, বিজ্ঞানী সমগ্র মানবজাতির কাছে দায়ী, বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্যেই শুধু দায়ী নন, প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রে এবং সারাবিশ্বে বিজ্ঞানের সৃষ্টিগুলোর যে ব্যবহার ঘটে, তার জন্য যৌথভাবেও দায়ী (১৯৭৫, ১০, ৩০/১:৫৩)। বিজ্ঞানীরা ২৭ তম পাগওয়াশ সম্মেলনে (১৯৭৭) পরিবেশের প্রতি তাদের দায়-দায়িত্ববোধ নিয়ে বলেন, মানুষের কর্মকান্ড দ্বারাই যেহেতু মানবজাতি রক্ষা পেতে পারে সেহেতু আমাদেরই উচিত বিজ্ঞানের অবদানসমূহকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো (১৯৭৭)। বিজ্ঞানের উন্নয়ন আমাদের পরিবেশকে ও সভ্যতাকে সঙ্কটের মুখে নিপতিত করলেও আমাদের নিজেদের মধ্যকার সহনশীলতার চর্চা, সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি এবং নৈতিক উপলব্ধির সহায়তায় উদ্ভূত পরিবেশ সমস্যা ও সভ্যতার সঙ্কট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারি।

মানুষ ও পরিবেশিকরণ নীতি

মানুষ, বিজ্ঞান ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া আজকের দিনের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা। মানুষের উৎপাদন ও বিনোদন কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশের জৈব, ভৌত ও অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধিতহারে বেড়েই চলছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই নির্ভরশীলতা নিয়ে দুটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে ঃ

১. চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি

২. মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি।

চরমপন্থীদের দাবী হল — মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে হবে। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবন যাপন থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রকৃতি নির্ভরশীলতা

একটি অনস্বীকার্য বিষয়। শিল্প-কারখানা, উৎপাদনমুখীনতা এবং সভ্যতার সৌধ বিনির্মাণের অন্ধমোহে দিক-বিদিক না তাকিয়ে আমরা শুধু প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বিনষ্ট করে চলছি। এজন্য চরমপন্থী পরিবেশবাদীদের শ্লোগান হল 'প্রকৃতির কোলে ফিরে চল'। পরিবেশ সমস্যায় চরমপন্থীদের অবস্থান সংরক্ষণমুলক। তাদের এই মতবাদ আগামীদিনের পরিবেশ মোকাবেলায় ভূমিকা রাখলেও সভ্যতার বিকাশকে তাঁরা পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করে থাকেন। কারণ উৎপাদন ও শিল্পের বিকাশ ব্যতীত সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা যায় না। বিপরীতক্রমে, মধ্যপন্থার অনুসারীগণ শিল্পভিত্তিক উৎপাদনকে অতিমাত্রায় কিংবা নিম্নমাত্রার কোনটিকেই সমর্থন করে না। বরং তাঁরা বলেন, উৎপাদনের বিশেষ গতিকে পরিবেশ সংরক্ষণের নামে হঠাৎ করে থামিয়ে দিলে উৎপাদনের ক্ষেত্রটি ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য, উৎপাদন ও শিল্পের উন্নয়নে পরিবেশীকরণ নীতির প্রস্তাব করা যেতে পারে।

আশির দশকের দিকে পাশ্চাত্যের অনেক পরিবেশবিদ পরিবেশ সঙ্কটকে স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনবার জন্য উৎপাদন, চাহিদা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার কথা বলেন। একথা সত্য যে, ভোগের সঙ্গে উৎপাদনের একটি সম্পর্ক রয়েছে। ভোগের বৃদ্ধি ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সৃষ্ট চাপ ইত্যাদি মিলিয়ে পরিবেশ বিপর্যয় ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। এ পর্যায়ে অনেকেই হয়তো ভোগ রোধ করার সপক্ষে মতামত দিতে পারেন। কিন্তু ভোগ রোধ করার নীতি উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরে প্রভাব ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে 'ভোগ-রোধ' অপেক্ষা ভোক্তার মানসিক তৃপ্তির মাত্রাকে সম্পদের পরিমাণগত বিবেচনার উপর সীমিত রাখতে হবে। কারণ নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে কোন দ্রব্য ভোগ করাটাকে ভোগ না বলে 'পেটুকপনা' বলা যায়। পেটুক ব্যক্তির প্রকৃত বিকাশ এবং তার সামর্থ্য ও অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের বদলে তার অধঃপতন ঘটায়। সুতরাং, ভোগকে সীমিত করে উৎপাদনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারলেই উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সইয়ে নেয়া যাবে। কারণ ভোগ রয়েছে বলেই মানুষ কর্মে সক্রিয় হচ্ছে, জীবনকে সহজ করতে সমর্থ হচ্ছে। ভোগকে কেন্দ্র করেই সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বহুমুখী শাখায় বিস্তারিত হচ্ছে। উৎপাদন, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন

প্রক্রিয়ার উদ্ভব হচ্ছে যা ব্যাতীত সভ্যতাকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হত না। কিন্তু একথাও সত্য যে শিল্পের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশে ক্রমবর্ধিতহারে সমস্যা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগামী দিনের সভ্যতার সঙ্কট নিরসনের জন্য আমরা দু'ভাবে পদক্ষেপ নিতে পারি।

১. উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবেশীকরণ ও

২. উৎপাদনের জন্য পরিবেশসম্মত রূপরেখা দাঁড় করিয়ে

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ বিপর্যয় এড়ানোর জন্য পরিবেশবিদদের অনেকেই ভোগ বা চাহিদার হ্রাসকরণ এবং জনসংখ্যা রোধের কথা বলে থাকেন। কিন্তু ই. টি. ফাদায়েভ "Problems of Environmental Production" (১৯৮৩) প্রবন্ধে বলেন, চাহিদা হ্রাসকরণ বা জনসংখ্যা রোধ করে পরিবেশ সমস্যা দূরীকরণ করা যায় না। কারণ ভোক্তার ভোগের উপর ভিত্তি করে একটি উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে ভোগকেই যদি নতুন শর্ত সংযুক্ত করা হয় তাহলে সামাজিক সম্পর্কে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। আবার, জনসংখ্যা রোধ যথার্থ সামাজিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সমগ্র উৎপাদনে অধিকতর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধিও প্রয়োজন। কারণ জনসংখ্যা উৎপাদনে উৎসাহ সঞ্চার করে থাকে। কারণ যে অর্থে শিল্প বিকাশ সীমাহীন ঠিক একই অর্থে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও সীমাহীন। আর এজন্য জনসংখ্যা রোধকরণে স্থায়ী যে কোন প্রয়াসই বিপদজনক, সভ্যতার বিকাশের জন্য অবনতিসূচক। ফলতঃ এটা শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ও সমাজের বিলুপ্তি ডেকে আনতে পারে। ভোগ বা চাহিদা ও জনসংখ্যা হ্রাসকরণ নীতি গ্রহণ অপেক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থা যা শিল্পে পরিবেশিকরণ ভাবনা আশাব্যঞ্জক ফল প্রদান করতে পারে।

ই. টি. ফাদায়েভ শিল্পের পরিবেশীকরণ বলতে বুঝেছেন - 'বর্তমান শিল্পের এমন একটি রূপান্তর সাধন যা এর উন্নয়নকে ব্যাহত করবে না অথচ একে নির্ভরশীল করবে বর্তমান পরিবেশগত সীমাবদ্ধতার উপর, এবং পরিবেশে কোন নেতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করবে না। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে শিল্পের পরিবেশীকরণে ফাদায়েভ কয়েকটি প্রস্তাব করেন ঃ

শুধু উৎপাদনের একচেটিয়া মাত্রাকেই অনুসরণ করবে না। বরং পরিবেশ ও পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রাকে ইতিবাচক দিকে নিয়ে আসতে পারবে। এজন্য পরিবেশীকরণের ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য দুটি বিষয় বিবেচনার রাখা যেতে পারে ঃ

১. টেকসই উন্নয়ন এবং ২. পরিবেশ প্রভাব নিয়ামক বা Environmental Impact Assesment (EIA) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ সঙ্কট নিরসনে এ দুটি-ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে–

পরিবেশ সংরক্ষণে টেকসই উন্নয়ন ও EIA এর ভূমিকা

সভ্যতার বিকাশ ও মানব উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই প্রত্যাশাকে নিশ্চিত করতে পারে। এ দুয়ের সুষম বিকাশ নিশ্চিত করতে না পারলে পরিবেশ ও সভ্যতার সঙ্কট এমন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হবে যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন হয়ে পড়বে। এজন্য টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি বর্তমান গবেষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। টেকসই উন্নয়ন হল– প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃৎকৌশলগত উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। সাম্প্রতিককালে যত ধরনের উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় তা প্রায়শ-ই পরিবেশকে মারত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়ে-ই হচ্ছে। যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী, ইরিগেশন ইত্যাদির নামে প্রস্তাবিত প্রজেক্ট সমূহ পরিবেশকে আক্রান্ত করছে। উন্নয়নের নামে পরিবেশ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, উন্নয়ন কে যেন টেকসই করা যায় সেজন্য সমকালীন পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে Procedures of Environmental impact Assessment (সংক্ষেপে EIA)*। EIA এর মূল লক্ষ্য হলো

> " ... to determine the likely environmental consequences of a project and which environmental protection measures need to be incorporated into its design, impleamentation and operation." (CEC 1993)

EIA এর বদৌলতে আমরা অপ্রত্যাশিত পরিবেশ দূষণের হাত থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত রাখতে পারি। সংক্ষেপে EIA এর মূল লক্ষ্য হল–

* অস্তিত্বশীল পরিবেশসম্মত শর্তসমূহ নির্দেশ করা।
* কোন প্রজেক্ট বা উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হলে তা পরিবেশের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর হতে পারে তার সম্ভাবনা যাচাই করে প্রজেক্ট অনুমোদন করা।
* লাভ ক্ষতির হিসেব বিশ্লেষণ করে —প্রশমিত করা যায় না এমনসব সঙ্কটের ন্যূনতম অবস্থা পরিমাপ করে অগ্রসর হতে হবে।
* পরিকল্পনাসমূহের পুনঃ বিবেচনা করা।
* পরিবেশের ক্ষতি করে না এমনসব বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে।

কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অর্থে অবগত হয়ে, লাভ-লোকসান বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করাই হল EIA এর মূল লক্ষ্য। টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নত বিশ্বে EIA ব্যাপক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উন্নয়নের দুটি ধারায় এর দু'ধরনের প্রভাব উল্লেখ করার মত। সে দুটি হল ঃ

ক. **বহিঃভুক্তি করণ তালিকা ঃ**

১. মানব সম্পদের উন্নয়ন, উদাহরণস্বরূপ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবকাঠামো বিনির্মাণ

২. মানব স্বাস্থ্য উন্নয়ন; পরিবেশ দূষণের প্রভাব সম্পর্কীয় শিক্ষা পরিবেশবিদ্যার জ্ঞান, টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ,

৩. পরিবেশসম্পর্কিত আইন ও প্রতিষ্ঠান বর্ধন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কিত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে EIA কে ততোটা কার্যকরী করা প্রয়োজন নেই।

খ. **অন্তর্ভুক্তকরণ তালিকা** ঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে EIA নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারেঃ

১. যোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রিত পরিসরে নিয়ে আসা।

২. শক্তি উৎপাদন বায়োমাস, কয়লা, পীট, তেল ও গ্যাস, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি উৎপাদন নিষিদ্ধ করা।

৩. জলজ সম্পদ নষ্ট করতে পারে এমনসব অবকাঠামোগত উন্নয়নকে নিরুৎসাহিত করা।

৪. শিল্প-কলকারখানা সার্ভিসকে নিয়ন্ত্রিত করা।

৫. পরিবেশগতভাবে হুমকি স্বরূপ এরকম স্থানগুলোকে সনাক্ত করতে হবে, যেমন -

ক. ভারী শিল্পকারখানা

খ. সম্পদ নিষ্কাশন শিল্পসমূহ

গ. অবকাঠামোগত প্রজেক্টসমূহ

পাশাপাশি সংরক্ষণ করতে হবে -

১. জাতীয় বন-এলাকা, জলজ এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন জায়গাসমূহ

২. ম্যানগ্রোভ এলাকা ইত্যাদি।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য EIA কে সক্রিয় করার জন্য বহুমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য এবং বিশ্লেষণী সমর্থের অধিকারী হতে হবে। জনগণকে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সঙ্গে সচেতন করে তুলতে হবে। পরিবেশের সঙ্কট সৃষ্টি করে এমনসব তথ্য ও তথ্যাদির জন্য ডাটা সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এজন্য পরিবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষা সম্প্রচার রাষ্ট্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ক্লাব, সেবা প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া আরো যেসব পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয় সেগুলো হলো -

ক. EIA বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা, আইনের সমতা ও দায়বোধ একাজে ভূমিকা রাখতে পারে।

খ. পারস্পরিক সহায়তার মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

গ. প্রতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে করে প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় কোন পরিবেশ দূষণ রোধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

ঘ. রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

নৈতিক পর্যালোচনা

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ সংরক্ষণ সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিবেশবিদগণ নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ করছেন। নৈতিকতা মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক সচেতনতা তথা বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দায়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এজন্য পরিবেশের সাম্প্রতিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য পরিবেশীকরণ, পরিবেশসম্মত উৎপাদন, টেকসই উন্নয়ন তথা EIA এর পাশাপাশি নৈতিকতাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। নৈতিকতার এই উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে পরিবেশ নীতিবিদ্যা (Environmental ethics) নামে আলাদা একটি জ্ঞানের শাখাও বিকাশ লাভ করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত পরিবেশবিদগণ বলেন, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে; সেটা হোক পরিবেশের স্বনিহিত কারণে কিংবা পরিবেশের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার কারণে। পরিবেশবাদী দার্শনিকগণ দু'দিক থেকে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দেখান। নিম্নের চার্টে তা দেখান হলু

ছক: ৫

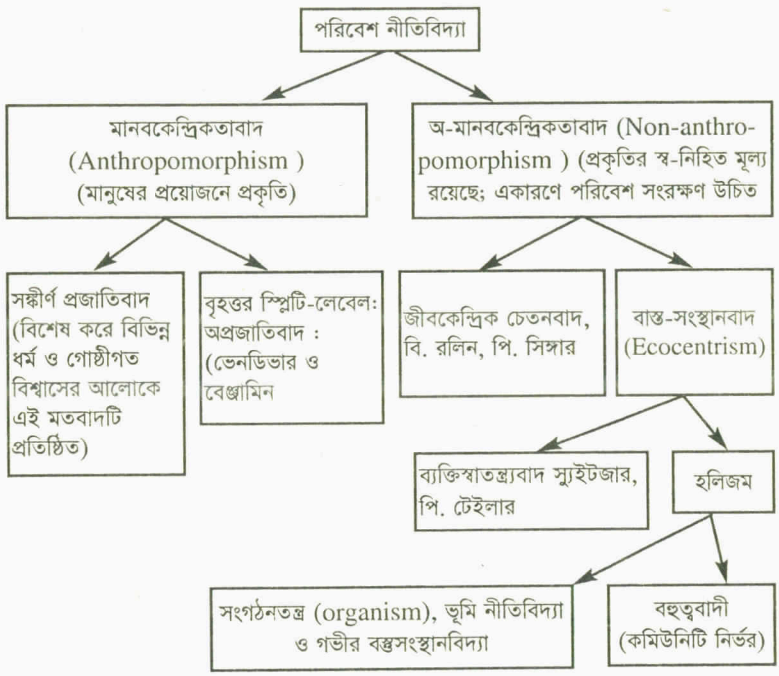

(সূত্রঃ Pojman, 2000.187)

পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের কোন দায়িত্ব-কর্তব্য আছে কিনা তা নিয়ে পরিবেশ নীতিবিদগণ দু'ধারায় বিভক্ত হয়েছেন; সে দুটি হল -

১. যারা ধর্মতত্ত্বের উপর নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চান- তারা মুলত মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবীয় ও অ-জীবীয় উপাদানসমূহ ব্যবহার করা যায় বলে দাবী করেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism)। এই মতবাদে মানুষকে লক্ষ্য ধরে অ-মানবীয় প্রকতিকে উপায় বা মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়।

২. অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Non-anthropocentrism) অনুসারে মানবীয় এবং অ-মানবীয় উভয়ের প্রতি যত্নশীল হবার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়।

পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ বিপর্যয় মানুষ সভ্যতা এবং তার পরিবেশকে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মানুষের আগামী নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণকে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আমরা পরিবেশ নীতিবিদদের মধ্যে বিদ্যমান দুটি বিতর্ক সংক্ষেপে আলোকপাত করতে পারি, সে দুটি হলঃ

ক. পরিবেশের কি অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে?

খ. পরিবেশ সংরক্ষণ কেন নৈতিক ?

পরিবেশের অন্তর্নিহিত মূল্য

প্রথমতঃ কোন একটি সত্তা যদি তার নিজের কারণে মূল্যবান হয়, তার মূল্যের জন্য অন্যকোন সত্যের উপর নির্ভর করতে হয় না; বরং অন্য কোনকিছু তার গুরুত্বের কারণে মূল্যবান হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সত্তাটি অন্তর্নিহিত অর্থে মূল্যবান হয়। আবার একধরনের 'মূল্য' আছে যা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে সত্তাশীল হয়ে থাকে; এদের নিজস্ব কোন স্বকীয়তা নেই। এধরনের সত্তাকে বলা হয় সহায়ক মূল্য বা বহির্মূল্য গুণ। সাম্প্রতিককালে আর্ণ নায়েসিস ও হোমস রল্স্টন প্রমুখ দাবী করেন যে, পরিবেশের নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। তাঁদের এপ্রসঙ্গে বক্তব্য হল কোন কিছুর মূল্য থাকার অর্থ-ই হল এটি আমাদের উপর কর্তব্য আরোপ করে। সুতরাং, মূল্যের ধারণার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা যেতে পারে পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। এ বিবেচনায় পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত।

পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য

পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি রকম হওয়া উচিত? নায়েসস এ প্রসঙ্গে দু'ধরনের মতবাদের কথা বলেন : ক. গভীর পরিবেশবাদ (Deep ecology) খ. অ-গভীর পরিবেশবাদ (Shallow ecology)।

দ্বিতীয় ধারা (গভীর পরিবেশবাদ) অনুসারে, দাবী করা হয়– পরিবেশের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। মানুষের জন্য-ই পরিবেশ। প্রকৃতির সম্পদসমূহ মানবমূল্যের জন্য প্রযোজ্য। পরিবেশের বায়োটিক ও সিমবায়োটিক ইত্যাদিসহ সকল প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ এগুলো আমাদের কৃষিজাত প্রয়োজন তথা ঔষধ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনে, মানবকল্যাণে যেহেতু প্রকৃতির সম্পদসমূহ ব্যবহৃত হয় সেহেতু পরিবেশ প্রকৃতি তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায় ঃ

১. পরিবেশ দূষিত হলে আমাদের জীবন যাপন অস্বাচ্ছন্দপূর্ণ হয়ে যাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

২. তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা পরিবেশের জন্য বোঝা স্বরূপ এমনকি বাস্তু-সংস্থানগত ভারসাম্যের উপর এটি ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

৩. 'সম্পদ' বলতে আমরা সেই সবকিছুকে বুঝব যেগুলো মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং, ব্যক্তিত্ববাদী বা মানবকেন্দ্রিকতাবাদী ধারায় যেসব পরিবেশবাদীগণ পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলেন, তাঁরা মানব কল্যাণের সর্বোচ্চ মাত্রাটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন আর পরিবেশ হল মানবকল্যাণের মাধ্যম। অগভীর পরিবেশবাদীগণ গৌণ অর্থে পরিবেশ সংরক্ষণের অত্যাবশ্যকতার কথা বলেন। বিপরীতক্রমে,গভীর পরিবেশবাদ অনুসারে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের নিজস্ব স্বতঃমূল্য বা অন্তর্মুখী মূল্য রয়েছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি তাদের নিজস্ব স্বকীয় মূল্যের কারণে মূল্যবান। সুতরাং পরিবেশের নিজস্ব মূল্যের কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত। এ ধারার মতাদর্শীগণ মূলত হিন্দুধর্মের 'আত্মাই ব্রহ্ম', স্পিনোজার 'ন্যাচুরা ন্যাচোরাটা' ইত্যাদির সহায়তায় কিংবা অধিবিদ্যক পন্থায় 'ব্যক্তির' সঙ্গে 'প্রকৃতি'র সম্পর্কায়ন করে থাকেন।

সমকালীন বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আগামী দিনের বিশ্ব এবং এর ভবিষ্যত প্রজন্মের অনুকূল পরিবেশের জন্য এই মতবাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

আর্নে নায়েসস হিন্দু 'আত্মার' ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবেশবাদী চিন্তার প্রস্তাব করেন। ভগবৎ গীতায় আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে - "He whose self is harmonized by yoga sees the self abiding in all beings and all beings in self; everywhere he sees the same" (Bhagavad Gita, 6: 29)। এটিকেই গান্ধী অনুবাদ করে বলেন - "The man equipped with yoga looks on all with an impartial eye, seeing fatman in all beings and all beings in Atmn"। নায়েসস গীতা এবং গান্ধীর আত্মা সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে দেখান জগতের মধ্যে আত্মা বিরাজমান। বেদান্ত দার্শনিকদের মতে, 'ব্রহ্ম হচ্ছেন বিশিষ্ট অর্থাৎ জীব-জগত রূপ শরীর বিশিষ্ট। জীব জগত ব্রহ্মের শরীর বলে-ই বস্তু থেকে ব্রহ্ম পৃথক নয়। এজন্য জগতরূপ শরীর বিশিষ্ট হয়েও ব্রহ্ম সর্বদা এক এবং অদ্বিতীয়ই থাকেন। এভাবে ব্রহ্ম ও জগত, আত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন হয়ে থাকেন। নায়েসস বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার আলোকে মানুষের প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতা দেখানো যেতে পারে। এই অবিচ্ছিন্নতাই বলে দিচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ আমাদের সঙ্গে আত্মিকভাবে অবিচ্ছিন্ন , এজন্য এদেরকে সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়।

পল টেইলর মূল্যের বিভিন্ন শ্রেণীকরণ করে দাবী করেন — যে কোন জীবসত্তার বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। জীবসত্তার এই বেঁচে থাকার মূল্যকে টেইলর এবং হোম্‌স রল্‌স্টন অন্তর্নিহিত মূল্য 'interest worth' বা বস্তুগত মুল্য বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে লিওপল্ড এর ভূমি-নীতিবিদ্যক মতবাদ থেকে টেইলর ভিন্নমত পোষণ করেন। লিওপল্ড বলেন, কেবলমাত্র জীবিত প্রাণী এবং উদ্ভিদেরই অন্তর্নিহিত মুল্য রয়েছে। কিন্তু টেইলর বলেন, সব জীবিত সত্তা, বস্তুজগতে বিরাজমান পদার্থকণিকার অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর সংরক্ষণশীল মানসিকতা প্রসঙ্গে চারটি নীতি রয়েছে ঃ

১. স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মানুষ এই ভূ-মণ্ডলের বাসিন্দা, অন্যান্য বস্তুসত্তার মত মানুষও বিবর্তনের ক্রমপ্রক্রিয়ায় এই ভূ-কমিউনিটির সদস্য হয়েছে।

২. ভূ-বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য বস্তুসত্তার সঙ্গে আন্ত:সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকেন্দ্রিক জৈবসত্তা প্রাণের উদ্দেশ্যধর্মীতাকে ধারণ করে থাকে। অনেকটা তার নিজস্ব মুল্যে বা মঙ্গলের কারণে।

৪. উপরোক্ত তিনটি বচনের আলোকে বলা যায়, মানুষ প্রাণীকূলের মধ্যে সর্বোচ্চ একথা যথার্থ নয়; বরং সকল প্রাণীই মূল্যের দিক থেকে সমান।

অতএব, প্রত্যেকটি জীব কাঠামো বা প্রাণীরাজ্যের সদস্যদের সমান অন্ত র্নিহিত এবং ইতিবাচক মূল্য রয়েছে। সুতরাং, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জৈবসত্তার এই সমতা থেকে বলা যায় প্রত্যেকের সমান মূল্য কামনা করে, তাদের প্রতি আমাদের নৈতিক বিবেচনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

হোমস রল্‌স্টন (১৯৮৮) এবং উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনা (১৯৮৫) প্রাণীর অন্তর্নিহিত মূল্যের কথা বলেন। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুসারী, পরিবেশের নিজস্ব মূল্য রয়েছে। পরিবেশের এই মূল্যের কারণেই তার অস্তিত্ব, সাংগঠনিক কাঠামোকে কোনভাবে বিপর্যস্ত করা উচিত নয়। রল্‌স্টন তো প্রাণের বির্তনের পট পরিক্রমা পর্যালোচনা করে দেখান, প্রাণের বিবর্তন যেহেতু ক্রমশ প্রজাতির সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমিক বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে উচ্চশ্রেণী ও নীচু শ্রেণীর প্রজাতির আবির্ভাব ঘটছে সেহেতু উচ্চশ্রেণীর প্রাণীসমূহকে যে অর্থে অন্তর্নিহিতভাবে মূল্যবান বিবেচনা করা হয়। সেই একই কারণে অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীকে মুল্যহীন বিবেচনা করা যায় না। রোলস্টন এই বক্তব্যের মূলকথাই হল সামগ্রিকভাবে পরিবেশের মূল্যই গুরুত্বপুর্ণ- এই মূল্য আমাদের মানবীয় প্রাণীর মূল্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট। একারণে মানব প্রজাতির মতো পরিবেশের প্রতিও আমাদের গুরুত্বারোপের প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে চলে আসে।

ধর্মীয় নৈতিকতার ভূমিকা

পরিবেশের উপর মানব সভ্যতা নির্মাণের যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে তা বিশ্বের সকল প্রাণীর-ই অস্তিত্বের সঙ্কট তৈরি করে চলেছে, যা প্রতিকারে ধর্মের ভূমিকার কথাও বলা হচ্ছে। ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ - 'Religion' এর মূল অর্থ হলো 'Religare' অর্থাৎ (Binding together), বাংলাতে যার অর্থ

দাঁড়ায় 'একীভূতকরণ'। এই 'একীভূতকরণ নীতি' সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও পরস্পরের মধ্যে সুখ দুঃখের বিষয়গুলিকে ভাগাভাগি করে নেবার চেতনাকে উজ্জীবিত করে থাকে। বলা বাহুল্য এই চেতনা পরিবেশের বিপর্যয় তথা সভ্যতার সঙ্কট নিরসনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিশ্বজনীন প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যে (World religions) মানবিক চেতনা পরিলক্ষিত হয়। যদিও বাস্তবে এর চর্চা সব সময় সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ব্যাত্যয়হীনভাবে পালন করতে দেখা যায় না। যেমন, খ্রীষ্টান ধর্মীয় শিক্ষার মূলে রয়েছে প্রভুর প্রতি ভালোবাসা ও যার প্রতিফলন ঘটে মানুষের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে এবং প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বাইবেলের জেনেসিস– যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তারও মূলকথা হল - ঈশ্বরের নিজস্ব প্রতিমার মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি অন্যান্য কিছুও সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য এবং সেসব সৃষ্টজীবকে বলেছেন -

> "Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it : and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that mouth upon the earth." [Bible, Old testament 1: 26]

আদিপুস্তকে ঈশ্বর মানুষকে এরকম 'কর্তৃত্ব করার' ক্ষমতা প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর প্রদত্ত এই ক্ষমতাই ইঙ্গিত করছে - মানুষ তার প্রয়োজন প্রকৃতি বা পবিেশকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু ধর্মনির্ভর এরকম স্থুল অনুভূতির কারণে মানুষ হয়তো যুক্তি দাঁড় করাতে পারে যে, প্রকৃতি ও পরিবেশকে মানুষের প্রয়োজনে ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করতে পারবে। ইসলামের বিশ্বজনীন অবদানের প্রমাণ হলো 'তাওহিদ' বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। এর অর্থ এবং তাৎপর্য হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নেই এবং তিনি স্বর্গীয় সত্তার প্রতীক এবং সকলের জন্য ওহী স্বরূপ। ইহুদী ধর্মে মানুষকে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রভুর অংশীদার হিসেবে দেখানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মে একক বিশ্বের অধিবাসী হিসেবে মানুষে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে জগতের সবকিছুর মধ্যে রয়েছে আন্তসম্পর্ক। আর এক্ষেত্রে মানুষের মূল কাজ হলো উচ্চতর ঐক্যের সন্ধান খুঁজে বের করা। প্রকৃতির প্রতি আমাদের আগ্রহ, সহানুভূতি এবং কল্যাণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন করার মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা সমুন্নত

করতে পরি। যেমন- একটি সমাজ যার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য এবং উপাদান আছে, অথচ কিয়দংশ মানুষকে বঞ্চিত না করেও প্রাণীর জন্য সরবরাহ করা যায়, তাছাড়া ব্যাপক জনগোষ্ঠী আছে যারা ইচ্ছে করলে তাদের অর্থ ও সময় উভয়ই খরচ করে প্রাণীদের পোষ্য এবং বন্যপ্রাণী প্রদর্শনীর জন্য সংগ্রহ করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে (ভূইয়া, ২০০১)।

হিন্দু, অরফিক, বৌদ্ধ, জৈন এবং পীথাগোরীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেও আমরা প্রকৃতির প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারি। হিন্দু পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ-এ প্রত্যক্ষভাবে মানুষ থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হবার পরোক্ষ ঈঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এর মূল কথা হল- পুনর্জন্ম অর্থই হল- মানুষ এজগতের যে কর্ম করবে তদনুযায়ী তার আত্মা পুনরায় দেহ ধারণ করবে। সকল কর্মের ফলশ্রুতিই হল পুনর্জন্মের মাত্রাগত ভিন্নতা।

হিন্দু জন্মান্তরবাদের ধারণা পাওয়া যায় পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক ব্যাখ্যায়। বস্তুত অরফিক দলভুক্ত লোকদের বিশ্বাস দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অরফিকদের পুনঃআবির্ভাব তত্ত্বের (Theory of incarnation) মূলকথাই হল জগত হল বস্ত-চক্র (Wheel of things), মানুষ তার সকল প্ররোচনায় নিজেকে এ চক্রে জড়িয়ে ফেলে। বস্তু-চক্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে সূত্রটি পীথাগোরীয় দার্শনিকগণ একটু ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করেন, সজীব প্রাণের সঙ্গে জৈবিক প্রাণের (মানবেতর এবং উদ্ভিজ্জগতসহ) যোগসূত্র রয়েছে, এ যোগসূত্রের মধ্যস্থতায় বিরাজ করে ঐশ্বী আত্মা; পীথাগোরীয়দের ভাষায় এটিই হল 'Soul daemons' । তাঁদের মতে, আত্মাকে 'transmigrate' করার জন্য এবং জন্মান্তরে মানবেতর প্রাণীর আকার গ্রহণ করা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন নৈতিক রীতিনীতির অনুশীলন।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হিন্দু, অরফিক এবং পীথাগোরীয় নৈতিক চিন্তার ফলত পরিণতি হল আত্মার মুক্তি লাভ। জন্মান্তরে আত্মা যেন উদ্ভিদরাজি, স্থুল শরীর, মানবেতর প্রাণী হয়ে না জন্মায় সেদিকে ছিল

তাদের দৃষ্টি। সুতরাং, এসব ধর্মীয় জন্মান্তরের ধারনায় মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী নিকৃষ্ট একথাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এ বিবেচনায় বৌদ্ধ ও জৈন নৈতিক তত্ত্বে আরো উদার ও প্রগতিশীল। বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার ও পঞ্চশীল' নীতি প্রত্যক্ষভাবে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা নিবদ্ধ করা হয়েছে। বৌদ্ধ পঞ্চশীলের প্রথম শীলই হল 'প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা'। দুঃখময় জীবন থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হলো উক্ত শীলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

বুদ্ধের আরো দুটি নীতির কথা ধরা যাক -'সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন করো' - কিংবা 'পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হউক, ভয়হীন নিরুপদ্রব হউক' - এই উক্তি দ্বারা তিনি মূলত প্রাণীকূলের সকল সদস্য দৃশ্য অদৃশ্য, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থুল-অতিকায়, নির্বোধ-বোধ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীকূলের নিরুপদ্রব অবস্থাই ছিল তাঁর কাম্য। আবার বুদ্ধের অহিংস নীতিতে আমরা খুঁজে পাই পৃথিবীর সকল প্রাণীকে সমভাবে দেখার এক মহান শিক্ষা। *সুত্তনিপাত* এর ভাষায় এই শিক্ষার গুরুত্বটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে - "মা যেমন আপন সন্তানের জীবন প্রাণের বিনিময় রক্ষা করতে চান, শিশুর দুঃখ বেদনায় কাতর হন, ঠিক সেরকম সকল জীবের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করতে হবে।" সুতরাং, বৌদ্ধ নৈতিক চিন্তায় মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হবার নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। চীনা আধ্যাত্মিক ধারাগুলিতে সঙ্গতি কে প্রকৃতি ও সমাজের অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে জ্ঞান করা হয়েছে। যেমন, কনফুসিয়ানবাদে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সামর্থের নৈতিক নীতিমালায় মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে 'সঙ্গতিকে' বেছে নেওয়া হয়েছে। টাওবাদে (Taoism) প্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য 'সঙ্গতি'কে একটি উৎকৃষ্টতম ধারণা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বাহাই (Bahai) বিশ্বাসে বলা হচ্ছে, 'ঐক্য ও শান্তির' লক্ষ্যে যে ক্রম পরিবর্তনশীল বিবর্তন ধারা রয়েছে সেই ধারায় গোটা মানবগোষ্ঠী হলো একটি জৈবিক উপাদান বিশেষ। যা হোক উপর্যুক্ত নৈতিক পর্যালোচনা থেকে আমরা ধরে নেব, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, চৈনিক, বাহাই এবং পীথাগোরীয় নৈতিক চিন্তায় মানুষের মুক্তি বা মোক্ষলাভের প্রশ্নটি মুখ্য হলেও প্রাণীর মুক্তির বা প্রাণীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের প্রসঙ্গটি হেয় করে দেখা হয়নি।

উপসংহার

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সভ্যতার অবয়ব ও পরিসর বৃদ্ধি করলেও নিশ্চিত জীবন-যাপনকে করে তুলছে সঙ্কটাপন্ন। আমাদের বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যত পরিবেশও হয়ে উঠছে জীবন যাপনের অনুপযোগী। তাই আমাদের আগামী দিনের পৃথিবীর কথা ভেবে পরিবেশ সংরক্ষণ, অন্যভাবে মানুষের নিশ্চিত ভবিষ্যত সংরক্ষণে প্রয়াসী হওয়া উচিত। এজন্য পরিবেশবিদগণ পরিবেশ সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নৈতিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আসছেন। আইন ও নৈতিক-চেতনা এ দুটিকে সমন্বিত করে আমরা প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কায়নের মাধ্যমে নব্য-মানবতাবাদের নতুন আঙ্গিক বিন্যস্ত করতে পারি। পাশাপাশি, এই সঙ্কট দূর করার ক্ষেত্রে যে প্রয়াশগুলো মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারবে তার অন্যতম প্রধান শর্ত হল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পরিবেশসম্মত তত্ত্ব ও গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করা। এক্ষেত্রে যে পরামর্শগুলো চরমপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে 'বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা' ও 'পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণের' মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি করতে পারবে তা-ই হবে সঙ্কটাপন্ন মানুষ ও প্রাণীজগতের অস্তিত্ব রক্ষার মূল কৌশল। এই কৌশল ও কর্মপন্থা সুপারিশের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ, পরিবেশ আইন , পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুকূল ধর্মীয় চেতনা, মানুষের প্রতি মানুষের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়াজাত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উল্লেখ্য, এসব নৈতিক চেতনার সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশীকরণ মানসিকতা সভ্যতা ও পরিবেশ সঙ্কট নিরসনে ইতিবাচক প্রেক্ষাপট তৈরী করতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা :

Caumoneur, Bary (1972), ***'The closing Circles', Nature, Men and Technology,*** New York, Stephnoskyv, G.A, (1973), *And His Habitat*, Vo-Procy Philosphy,

Charter For scientific (1963), ***Works And constitution of the World Federation of Scientific Works*** (*WFSCW*, London 1965).

Commission of the European communities (CEC, 1993), ***Environmental Manual,*** Directiorate General for Development, Brussel.

Fadayev, E.T., ***'Problems of Envirnmental Production', In Philosophy and Ecological Problems of Civilisation,*** ed. by Ursul, A.D., Pregress Pub., 1st print 1983.

Frankena, William. K. (1945), ***'Ethics and the environment', In Contemporary Moral Problems,*** ed. by J.P. Whlu, New York, West publishing Co. st. Pau.

পাল, গৌতম (১৯৯৩), ***পরিবেশ ও দূষণ,*** কলকাতা।

P.H.D. Forest, (1975), ***The International Scientific Community And the Global Social*** responsibility of Scientists, *Encyclopedia Moderna.*

Perroni, C. and Wigle, R.M. (1994), ***Modelling the Links between International Trade and the Environment*** (mimeo), Wilfricd Laurier University, June 1992.

Pojman, Louis. P. (2000), ***Global Envirnmental Ethics,*** Mayfield Pub. Co., California.

Rolston-III, Holmes (1988), ***Environmental Ethics, Philadelphia*** : Temple University press,

Russel lenstein,(1955) *Manifesto*,

Schwitzer, A. (1987), ***Civilisation and Ethics,*** London, Adam and Charles Black.

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ (২০০১), ***'মানবেতর প্রাণীর অস্তিত্ব সংরক্ষণ ঃ প্রসঙ্গ নৈতিকতা',*** দিদাসকালোস, কলা ও মানবিকী অনুষদ সেমিনার জার্ণাল, সংখ্যা-১, সম্পাদনায়. ডঃ আফসার আহম্মেদ

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

বাংলার সমাজ ব্যবস্থা নিরীক্ষণে নজরুল

মোঃ মাহমুদ হাসান*

Social Intrepretation of the Society of Bengal by Nazrul

Md. Mahmud Hasan

Abstract : Kazi Nazrul Islam, the rebel poet of Bengali Literature not only wrote poetry, rather he talked about the complex social relations of the existing society. He identified the problems of the then Indo-Bangladesh society and state. He is the first man who boldly demanded the total independence of this sub-continent in his writings and as a result of it, the British Government of India put him into jail. Nazrul, the brave and indomitable lion, did not care for it; furthermore, he advocated for the emancipation of the colonized Indian people and, for which, he won the hearts of the common people gaining enormous esteem, love and reputation. He did not disclose his windows of thought like the social thinkers, but a good number of his writings coincides with the theme and idea of sociological phenomena, for example, communal harmony, caste system, social inequality, colonial exploitation, underdevelopment of the society of Bengal. He pointed out the critical ideas in another form stressing the need for solidarity among the communities of India, specially, the two big communities, Hindu and Muslim. In this article it has been attempted to explore and observe sociological thinking of Nazrul with special reference to the society of Bengal.

* মোঃ মাহমুদ হাসান, উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

বহুমুখী প্রতিভা, গুণ ও লেখনীশক্তির অধিকারী নজরুলের লেখার একটা বিরাট অংশে সমাজ বিশ্লেষণ, ঔপনিবেশিক সমস্যা, সামাজিক বর্ণপ্রথা, সামাজিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়, সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন এবং সামাজিক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের জাল বিশ্লেষণসহ উপর্যুক্ত বিষয়ে যুক্তিযুক্ত সমাধানের সুপ্রচুর প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। মনে হতে পারে যে, অধিকাংশ কবিই তো কল্পলোকবিহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং তাঁদের রচনার সাহিত্যমূল্য সমাজ বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন ও অপ্রযুক্ত। উপর্যুক্ত বক্তব্যের অসত্যতা নির্ণয় করা হয়ত আপাতদৃষ্টে বেশ কঠিন; কিন্তু যিনি একই সাথে দার্শনিক ও কবি, সমাজকর্মী ও লেখক, সংস্কারক ও দিশারী তাঁর বেলায় একথা সত্য যে, সমাজ বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী ও সক্ষম। বরং তিনি সমসাময়িক সমাজ বিশ্লেষণে অতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কবিতার জন্য, লেখার জন্য কারাবরণ ও কারা নির্যাতন অতি উজ্জ্বলভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, নজরুল কবি হয়েও আপাদমস্তক একজন মাটির মানুষ, তিনি এ সমাজের জ্বালাময়ী বক্তা। তিনি যখন সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের ডাক দেন, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কথা বলেন তখন তাঁর কথা সমাজ পরিবর্তনের এক বিশাল দিককে নাড়া দেয়।

সমাজতত্ত্ব ও লেখক ঃ

Man is by nature a social and political animal. He, who does not live in a society, is either a beast or a god. এ্যারিস্টটলের এ কথার ওপর মনে হয় কোন বিতর্কই ধোপে টেকে না। আর এ জন্যেই মানুষ তার সামাজিক প্রয়োজনে সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে বহুবিচিত্ররূপে, শতধারায়। সমাজচিন্তানায়কগণও যুগে যুগে দেশে দেশে তাই সামাজিক বাস্তবতানির্ভর প্রপঞ্চসমূহের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব মূলত সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক বিজ্ঞানের স্বরূপের গিঁট উন্মোচন করতে গিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার সমাজচিন্তকদের এক দিকপাল ম্যাক্সওয়েবার বলেন, Sociology is a science which attempts the interpretative understanding of

social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effects.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক চিন্তাতত্ত্বমূলক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ঘটনার কার্যকারণসূত্র আবিষ্কার করা। যিনি সমাজের সচেতন চিন্তক বা লেখক তিনি অবশ্যই চোখ বুজে বসে থাকবেন না, বরং তিনি তাঁর সামনের বিদ্যমান সমাজবাস্তবতাকে টেনে আনবেন। এটাকে লেখকের সামাজিক দায়িত্ব বলা যেতে পারে। বিশ্বের বিদগ্ধজনদের লেখার মধ্যে এ অনুভূতির প্রবণতা উজ্জ্বলভাবে লক্ষ্যণীয়।

প্রশ্ন হতে পারে, কবি সাহিত্যিকরাও এ সামাজিক দায়িত্বের দায় পালনে অনিবার্যভাবে বাধ্য কিনা। কেননা, কবিরা তো সমাজরূপ ফুলবাগানের মুক্তবিহঙ্গ, আপন মনের আনন্দে তাঁরা অনুভবের রাজ্যে বিচরণ করেন। কিন্তু আধুনিক যুগমাত্রিকতা কাব্যে সমাজভাবনার একটা স্থান করে দিয়েছে। আর তাই দেখা যায় যাঁরাই এ সমাজ সচেতনতার আদলে নিজেদেরকে প্রকাশিত করেছেন শিল্পের সকল কলাকৌশল ও দাবীকে দিব্যি রেখে, কাব্যের উৎপ্রেক্ষাময় কল্পলোকবিহার তাঁদেরকে বঞ্চিত করেনি; সমাজ, সময় ও বাস্তবতা তাঁদেরকে রাজটীকা দিতে দ্বিধা করেনি, বরং জাতি তাঁদেরকে নির্বাচিত সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

সমাজ নিরীক্ষণ ও নজরুল ঃ

কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যের একজন Major poet বা বড় কবি। বাঙলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তিনি দক্ষতা ও মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সামাজিক চিন্তাধারার রাজ্যে তাঁর ভূমিকা একজন সমাজতাত্ত্বিকের মত নয় একথা সত্য, সে পথ তিনি বেছেও নেননি; কিন্তু কবি ও লেখক হিসেবে সামাজিক দায়িত্বশীলতার যে পরিচয় আমরা তাঁর রচনাসমূহে পাই, তা সত্যিই প্রাণপ্রচুর, উদ্দীপ্ত ও দুর্লভ। একথা বলা মনে হয় অসমীচীন হবে না যে, কবি হিসেবে কল্পলোকবিহারের ব্যাপারটা বাদ দিলে তিনি আপাদমস্তক একজন সামাজিক কবি। তাঁর কল্পলোকবিহার তাঁর কাব্যের মূল সুর হয়ে ওঠেনি; স্বপ্নময় অনেক উপত্যকা তিনি ঘুরেছেন কিন্তু সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেননি, ফিরে এসেছেন ধূলির ধরার মানব

সমাজে। বাংলার মানুষ ও সমাজের সমস্যা, সমস্যার স্বরূপ এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে সাজিয়েছেন; ফলে তিনি একজন সমাজবাস্তবতা নিরীক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি হয়ে উঠেছেন সমাজের কবি, মানুষের কবি।

নজরুল ইসলাম স্বজাতি, স্বকাল, প্রবহমান সামাজিক-রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাগুলোকে তাঁর রচনার উপাদান বানিয়েছেন অবলীলায়। সমসাময়িকতাকে তিনি বিচিত্ররূপে মনোমোহন নৈবেদ্যে পরিবেশন করেছেন। তিনি পরাধীন ভারতের তথা বাংলার সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তার নিদানও নির্দেশ করেছেন। কবি হিসেবে তাঁর এ অসামান্য ভূমিকা তৎকালীন সাহিত্যিকদের বা সমালোচকদের কারো কারো দৃষ্টিতে বিরূপভাবে সমালোচিত হয়েছিল। একদল রবীন্দ্রানুসারী তাঁর নিকট এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এদের পাত্তা দেননি, বরং নজরুলের যুগমানস প্রতিফলিত রচনাকে অভিনন্দিত করেছেন, আশীর্বাদ দিয়েছেন।

নবজাগৃতির চিন্তাধারা ঃ

পুরাতন ও জরাগ্রস্তকে পিছনে ফেলে নতুনের উদ্বোধন করার ওপর নজরুল বারবার গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ, তাঁর মতে পুরাতন সমাজের অভ্যন্তরে নবসৃষ্টির প্রসববেদনা আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুরাতন সংস্কার ও বিশ্বাস সামাজিক গতিশীলতার পথ রুদ্ধ করেছে এবং স্থবিরতা ও জড়ত্ব আনয়ন করেছে। এজন্যে তিনি কাল বৈশাখীকে নতুনের প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাসে' সে আভাস দিয়েছেন এভাবে ঃ

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন উড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে এভাবে নাড়া দিতে চান বলে প্রথমেই এভাবে তাঁর আবির্ভাবকে নির্দেশ করেছেন। নজরুল যে সময় আবির্ভূত হন সে সময় এ উপমহাদেশ বৃটিশের শাসন-শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট ছিল। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা ও আত্মজাগৃতি ব্যতীত সমাজ ও দেশের তথা মানুষের সার্বিক মুক্তি আসতে পারে না বলে তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে কলম চালালেন। একদিকে প্রাচীন সমাজের অভ্যন্তরস্থ জরাজীর্ণ মূল্যবোধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পঙ্কিলতা, সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল, অপরদিকে ইংরেজের দাসত্ব ও অধীনতা মানবমনকে আরো পঙ্গু, সংকীর্ণ ও অনুদার করে রেখেছিল। স্বাধীন চিন্তাধারা উন্মেষের জন্য এবং বদ্ধ, জরাজীর্ণ সমাজকে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তিনি পথ নির্দেশ করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, পুরাতনকে দিয়ে বিপ্লবাত্মক ও সৃষ্টিধর্মী কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়, কারণ ওরা পশ্চাৎমুখী। তাই তিনি নবশক্তি, নবসৃষ্টি ও নতুন জীবনধর্মী পরিবর্তন আনয়নের জন্য তরুণের ও যৌবনের শক্তিকে শনাক্তপূর্বক তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাদের নির্ধারিত সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে আহবান জানালেন। তিনি বাংলার যুবশক্তি ও ছাত্রশক্তিকে আহ্বান করলেন ঃ

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়বাদল।
আমরা ছাত্রদল।।
মোদের আঁধার রাতে বাঁধার পথে
যাত্রা নাঙা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়।
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল।।

(ছাত্রদলের গান)

এখানে কর্মনীতি হিসেবে তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান হবে চলার পথের আলোকবর্তিকা। এই আলোতে তরুণ শক্তি সম্মুখের পথ দেখে চলবেন। কিন্তু নতুন সৃষ্টির জন্য তাকে রক্ত দিতে হবে, অনেক কিছুই ধ্বংস করতে হবে। সেজন্য তিনি প্রথমে ধ্বংসকে আহবান জানাচ্ছেন ঃ

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন,
আসছে নবীন জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!

(প্রলয়োল্লাস)

ধ্বংস না হলে যথার্থ নতুন সৃষ্টি হবে না বলে তিনি যুবশক্তিকে উদাত্তকণ্ঠে আহবান জানাচ্ছেন ঃ

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্।।
নব জীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ।
বাহুতে নবীন বল।
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহবান
ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্।।

(চল্ চল্ চল্)

এটি একটি শক্তির মন্ত্র, শক্তির উদ্বোধন; অপরদিকে মৃত্যুর আহবান ও ধ্বংসের ডাক এবং এরই পাশাপাশি নতুন সৃষ্টির প্রসববেদনা। এক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবিতায় এক বিদ্রোহী আমিত্ব সত্ত্বার চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন। এ আমিত্ব কোন ব্যক্তিগত আমিত্ব নয়। এ আমিত্ব হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার ও নবসৃষ্টির শক্তিসাধনার সার্বজনীন দুর্বিনীত আমিত্ব। এ আমিত্ব যুবশক্তির মধ্যে বিস্তারলাভ করলে অন্যায়, অনাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, উৎখাত হতে বাধ্য। কারণ এ আমিত্বের মধ্যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা তাই তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্রোহের প্রকাশ নয় বরং এটা হচ্ছে অনাসৃষ্টির প্রতিবাদে নবসৃষ্টির ক্ষমতায় সমর্পিত এক বিশ্বজনীন উপকারী আমিত্ব। এজন্যে দেখা যায় তাঁর বিদ্রোহী কবিতা কোন নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রকে ঘিরে আবর্তিত নয়, বরং তা সর্বব্যাপী চারিত্র্যস্বভাবে মহিমান্বিত যা তাঁর রচনার সময় থেকেই শুধু নয়, অনাগত ভবিষ্যতের বিশ্বসাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ।

নজরুল যৌবনশক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি যৌবনের ও বার্ধক্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু বয়স দ্বারাই তরুণ হওয়া যায় না। যার বয়স তারুণ্যকে স্পর্শ করেছে তিনিই তরুণ নন, বরং মনের শক্তিকে তরুণ্যের মাপকাঠি হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে বার্ধক্যও বয়স বেশি হওয়ার ফলাফল নয়। তিনি তাঁর ভাষায় বার্ধক্য ও তারুণ্যকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন ঃ

বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব-মানবের অভিনব জয়-যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচ-কাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কংকালসার - বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা

যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি - যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কংকাল-মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি -- যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন।

(যৌবনের গান)

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ (দারিদ্র, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, সাম্প্রদায়িক সংকট, ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর মুখোশ উন্মোচন) ঃ

একজন সমাজ বিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে সমাজের সমস্যা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা। নজরুল ইসলাম তা করেছেন। তিনি তাঁর সময়ের প্রধান তিনটি সমস্যা, দারিদ্র বা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণশৃংখল এবং জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির সমস্যাকে তাঁর কাব্যে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁর ভূমিকা সমাজবিজ্ঞানীর মত। সস্তা সমালোচকরা তাঁকে যুগের কবি, চারণ কবি বলে চিহ্নিত করেছে, তাঁর অন্তর্নিহিত কাব্যবিচার ও সমাজমনস্কতাকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু কবি জানতেন, যারা সমাজ বিনির্মাণ করবে তারা ঘুমিয়ে আছে। তাদেরকে জাগাতে হবে; তাই নবযুগের সানাই বাঁজাতে তিনি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে মোটেও অসচেতন ছিলেন না। সমসাময়িকতার কালোত্তীর্ণতাকে অন্তর্দর্শন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলে জীবনদর্শনকে কী সহজ সাবলীল ভাষায় উচ্চারণ করেন যেখানে ধ্বংস ও সৃষ্টি পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে ঃ

আমি হোমশিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;
....।
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সববাঁধ।

(বিদ্রোহী)

নজরুল সামাজিক অনুষঙ্গে কী রকম জ্বলে উঠেছিলেন, কী রকম নিবেদিতপ্রাণ মসীযোদ্ধা হয়েছিলেন, বিদ্রোহী, ধুমকেতু, প্রলয়োল্লাস, সাম্যবাদী, সর্বহারা, কান্ডারী হুঁশিয়ার, কুলিমজুর, ফরিয়াদ মানুষ প্রভৃতি কবিতা থেকে তার প্রমাণ মেলে। চতুর্দিকে সামাজিক অসংগতি ও শোষণ চলছিল। কবি হিসেবে শুধু নয়, সমাজের একজন সচেতন মানুষ হিসেবে তাই এসব অসংগতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে চিহ্নিত করাকে তিনি পবিত্র কর্তব্য হিসেবে মনে করেছিলেন, যেজন্যে তিনি কোন অপরিণত, অযথার্থ ও বিরুদ্ধ সমালোচনাকে পরওয়া করেননি। তিনি বারবার সমাজের মানুষের কাছে ফিরে গিয়েছেন।

যেখানেই অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য, শোষণ ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ দেখেছেন, সেখানেই তার প্রতিবাদ করেছেন। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি নিরাপোষ যোদ্ধা সেজেছেন এবং সে জন্যেই তিনি "বিদ্রোহী" কবি আখ্যা পেয়েছেন। নজরুলের সামাজিক দায়িত্ব পালন ও সমাজ সংশ্লিষ্টতার পরিচিতি এ বিশেষণ দ্বারাই জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। জুলুমের অবসানে তাঁর কী সম্পন্ন জীবনচেতনার ঘোষণা ঃ

আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে।

মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত

আমি সেইদিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না --

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না --

বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত

আমি সেইদিন হব শান্ত।

(বিদ্রোহী)

নজরুলের পূর্বেকার কোন লেখকের লেখার মধ্যে এরূপ সামাজিক অঙ্গীকার স্থানলাভ করেনি। এ দ্ব্যর্থহীন বজ্রঘোষণা কবিকে চিরকাল যুগ-স্রষ্টার আসন দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের জগতে তিনি নবতর এক ধারা এনেছেন যাকে পরবর্তী কবিরা এড়াতে বা অস্বীকার করতে পারেননি, বরং নজরুল

চিন্তাসাগরে অবগাহন করেছেন এবং করছেন। তিনি তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করেছেন, তার বাইরে থাকেননি, আবার তাতে একাকার হয়েও যাননি। তিনি কারাবরণ করেছেন সত্যের জন্যে। মানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি দুর্ভোগের পরিণামচিন্তা করেননি। সমাজের কল্যাণচিন্তা, জাতির স্বাধীনতা, স্বকীয়তা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানে তিনি সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যখন বলেন ঃ

আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;
বল বীর
চির উন্নত মমশির!

(বিদ্রোহী)

ধর্মীয় চিন্তায় নজরুল ঃ

একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তিকে, যিনি সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী, অবশ্যই সামাজিক নানাবিধ সম্পর্ক অধ্যয়ন করে তার নির্যাস বের করে আনতে হয়। সমাজ যেহেতু জটিল সামাজিক সম্পর্কের জাল দ্বারা আচ্ছাদিত সেহেতু সামাজিক সম্পর্কের পাঠোদ্ধার ও মর্মোদ্ধার করা তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস যেখানে সামাজিক সম্পর্ক এক বিচিত্রমুখী ও বহুরূপী চারিত্র্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এখানে হিন্দু-মুসলিম দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় ব্যতীত আরো অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে। বলা অসমীচীন হবে না যে, এক হিন্দু সমাজে যে বর্ণপ্রথা বিরাজমান রয়েছে তার বদৌলতে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে বহুবিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাতজ্ঞান, ভেদজ্ঞান, ছোঁয়াছুঁয়ি ও অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যে নানা সম্পর্ক তৈরি করে রেখেছে। নজরুল যেহেতু অবিভক্ত ভারতের নাগরিক হিসেবে নিজেকে পেয়েছিলেন, সমাজ নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের বেলায় তাই তিনি ভারতীয় অবিভক্ত বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তাঁর রচনার উপাদান খুঁজে নিয়েছেন। তিনি মুসলিম সমাজের

গোঁড়ামী, কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা ও সামাজিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান যেমন করেছেন, তেমনিভাবে করেছেন হিন্দু সমাজেরও। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মুসলিম সমাজ অপর বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দুদের থেকে শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও সংস্কৃতিতে অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। কেন এই পশ্চাৎপদতা ? যখনই তিনি তার কারণ অনুসন্ধান করতে যান ততবারই তিনি বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতাকে টেনে আনতে গিয়ে জড় ও ক্লৈব্য মানসিকতা লালনকারীদের সমালোচনার শিকারে পরিণত হচ্ছেন। তাঁকে তখন একদল লোক কাফের ফতোয়া দিতে পিছপা হচ্ছেন না। আবার অনুরূপভাবে যখন তিনি হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী ও কুসংস্কারকে চিহ্নিত করছেন তখন যবন আখ্যা পাচ্ছেন এবং তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতাকে অনুধাবন ও অনুসরণজনিত পাঠপ্রক্রিয়ায় নামলেই সমাজের কোন না কোন অংগ সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই তাঁর সামাজিক ঘটনা পরিবীক্ষণোওর সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষিত ও বিশেষায়িত হয়েছে। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নজরুল কোন সমালোচনাকে পরওয়া করেননি, বরং যা তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে তা নির্দ্বিধায় ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলায় প্রকাশ করেছেন। সত্য বলার এ সাহস অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এটি সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সত্যকে দেখিয়ে দেয় এবং অপরদিকে লেখক তাঁর সামাজিক সংস্কারকের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন। নজরুল একই সাথে সমাজ সচেতন ও সমালোচক এবং অপরদিকে দায়িত্বশীল পর্যবেক্ষক ও সমাজসংস্কারক।

তাঁর বিখ্যাত *মানুষ* কবিতায় আমরা দেখতে পাই তিনি হিন্দু ও মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত স্বার্থপরতাকে উজ্জ্বলভাবে টেনে আনছেন ঃ

> 'পূজারী, দুয়ার খোল,
> ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!'
> স্বপ্ন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়
> দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!
> 'জীর্ণ-বস্ত্র, শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
> ডাকিল পান্থ, দ্বার খোল বাবা, খাইনি তো সাত দিন!

সহসা বন্ধ হল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!

....

মসজিদে কাল শিরনী আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি!
এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন,
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!
তেরিয়া হইয়া হাকিল মোল্লা, ভ্যালা হল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গোভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা ?'
ভুখারী কহিল, না বাবা! মোল্লা হাঁকিল - তা'হলে শালা --
সোজা পথ দেখ! গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!

....

মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!

....

তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয়!

(মানুষ)

এ কবিতায় তিনি ধর্মের নামে স্বার্থপরতার ও ভন্ডামীর মুখোশ উন্মোচন করেছেন, মানবতার জয়গান গেয়েছেন। এখানে তিনি মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয় -- এ বিষয়টি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে সমাজের বিদ্যমান অসংগতিকে স্পষ্ট করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুল ধর্মের মহান শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। বিদ্রোহ করেছেন ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে। যেখানে পরাধীনতা, মানুষের দাসত্ব ও অপমান নিত্য প্রবল, আত্মজাগৃতি যেখানে তিরোহিত, মানুষ ও মানবতা যেখানে চিরলাঞ্ছিত সেখানে ধর্মের ভূমিকা হবে পৌরুষ পুনরুত্থানের, মানবতা পুনঃস্থাপনের। তাঁর কথায় ঃ

কিসের ধর্ম ? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল ঝড়কে আমি

বাঁধবো, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করবো। সব ছারে-খারে দিয়েও আমি বাঁচবো।

আমার আবার ধর্ম কি ? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেংগে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি ? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন-বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি ? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি ?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি ? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি ? ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়- এই ভন্ডামী থেকে চলে আয়। তোরা বল, আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে ? দাস কখনো দাসকে শেখাতে পারে ? আমরা কিছু শিখবো না, আমরা কিছু শুনবো না; আগে বাঁচবো -- আমরা বাঁচবো।

(আমার ধর্ম)

হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে মিলন প্রয়াস ও সামাজিক সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ ঃ

তিনিই একমাত্র বাঙালি কবি যিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অজস্র লেখা লিখেছেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন, দেবী বন্দনা করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, তাহলো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চমৎকার মধুর সম্পর্ক স্থাপন। তিনি নিজে মুসলিম হয়েও হিন্দু মহিলা বিয়ে করেন এবং স্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছেমতো ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেন।

সামাজিক সংহতি ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানীরা এ জন্যে সংহতির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সংহতি রাজনীতি ও সার্বভৌমত্বের প্রহরী বলা যেতে পারে। নজরুল এ সংহতি বা ঐক্য

জোরদার করার জন্যে কবিতা লিখলেন, গান লিখলেন, প্রবন্ধ লিখলেন। সামাজিক ভেদ-বৈষম্য তৎকালীন সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, বিশেষত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ছিল। তিনি এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি, আস্থা, ও পারসপরিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্যে কবিতা ও গান রচনা করতে থাকেন। 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় তিনি লিখলেন ঃ

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম"? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কান্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

বর্ণপ্রথার সমালোচনা ঃ

সামাজিক গবেষণায় দেখা যায়, সমাজ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজ বর্ণপ্রথা ও ছুঁতমার্গে বিশ্বাসী। বর্ণপ্রথার কারণে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে উঁচু-নীচু নানা ভেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এবং এর পরিণতি কখনো কখনো অতি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়। জাতের নামে ব্যক্তি ও সমাজকে খান খান করা হয়েছে এবং মানবতার অপমান করা হয়েছে বলে নজরুল মনে করেন। বর্ণপ্রথা ও তথাকথিত জাতের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ঃ

জাতের নামে বজজাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ-খান!
এখন দেখিস ভারত-জোড়া
পড়ে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া।।
জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল ?

(জাতের বজ্জাতি)

জাতবিচার করতে গিয়ে মানুষ আজ মরণের দিকে ছুটে চলেছে। তাঁর ভাষায় ঃ

এদিকে উচ্চজাতি মৃত্যুকালেও নিম্নজাতিকে এক ধাপ উপরে উঠতে দিবে না। জমিদারের জমি নিলামে, তবু সে প্রজার হাত ধরিবে না। বাবুরা ছোট লোকদের এখনও দূরে রাখিতেছেন। এ দেশী বড় লোকেরা ধর্ম সমাজ এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও আভিজাত্য ও কালচারের গর্বটুকু ভুলিতে পারিতেছেন না। সমস্ত জাতিটা যেন মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

....

নিম্নজাতি - জাতির অধিকাংশ লোক যেখানে ছিল, বাবুর সমাজ তাহাদিগকে সেইখানেই চাপিয়া রাখিল। .... নিম্নজাতির কথা বলাও যা, ভূতের কাছে রামনাম করাও তাই।

(লাঞ্ছিত)

মুসলিমদের প্রতি আহ্বান ঃ

নজরুল হিন্দু সমাজকে জানার জন্য মুসলিম সমাজের প্রতি আহবান জানান ঃ

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবার কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায় ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চীন, জাপানী, হনলুলু গ্রিনউইচের ভাষা জানি ইতিহাস জানি। তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশির ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টা করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয় Penny wise pound foolish. আমাদের Next door neighbour এর মন থেকে আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেইদিন যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে

Competition হবে সে competition হবে cultured মনের Chivalrous competition — sportsman like competition.

(মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা)

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে, এ দু'সম্প্রদায়ের মাঝে সদ্ভাব, সুসম্পর্ক গড়ে না উঠলে পরাধীন জাতি স্বাধীন হতে ব্যর্থ হবে এবং অন্যদিকে সামাজিক ভারসাম্য ও শান্তি বিনষ্ট হবে। তাঁর ভাষায় ঃ

হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব, অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষানস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে -- এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাজে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম -- আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর।

(যদি আর বাঁশি না বাজে)

তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এ চেষ্টা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম, তাঁর পরে আর কোন কবিকে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

শ্রমের মর্যাদা দান ও সাম্যবাদী চিন্তাধারা ঃ

যে শ্রমিক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সভ্যতার প্রতিটি ইমারত নির্মাণ করেন, নজরুল ইসলাম তাদের কথা চিন্তা করেছেন। শ্রম, শ্রমের মর্যাদা দান এবং নিপীড়িত মানুষের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় উচ্চকিত। শ্রমজীবী জনতার প্রতি গভীর মমত্ববোধের কাব্যিক সন্দর্শন এ-ই প্রথম ঃ

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করিয়া জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?

....

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

....

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনে এক মিলনের বাঁশী।

....

মহা-মানবের, মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।

(কুলি-মজুর)

নজরুল ইসলাম যে ধূলির ধরায় বাস করেছেন, মানুষের কত কাছে বাস করেছেন, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে কত নিগূঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও ভালবেসেছেন, তা এ থেকে অনুমান করা যায়। অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র দ্রোহ উচ্চারণ করেছেন। অর্থনীতি যে মানব জীবনের প্রধান নির্ধারক ভূমিকা পালন করে এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন বলেই অর্থনৈতিক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

তিনি সাম্যচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হলেন এবং সব নরগোষ্ঠীগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে ঘোষণা করলেন ঃ

গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,

সবদেশে, সবকালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

(মানুষ)

কৃষক-শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে নজরুলের বক্তব্য ঃ

আপনারাই (কৃষক শ্রমিক) দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ। মাটির মায়ায় আপনাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই। রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া দিন নাই রাত নাই সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই ত এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মত লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটি লইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির নেন কিম্বা তাকে শির দেন, -- এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর যে শস্য শ্যামল মাঠ, আপনারা আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষায় আকাশ ভরিয়া বাদল নামে ----------- এ মাঠ চাষার এ মাটি চাষার, এর ফুলফল কৃষক-বধূর।

(কৃষক শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ)

ইসলামী আদর্শবাদের উপস্থাপন ঃ

কবি হিন্দু-মুসলিম মিলনের বাণী প্রচার করেছেন যা অনেকেই সুনজরে দেখেনি। শুধু তাই না, অনেকে তাঁকে কাফের বলতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু তিনি এতে দমে যাননি। তিনি স্বজাতি-ধর্ম-সমাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মুসলিমরা তৎকালে সব ব্যাপারেই পিছিয়ে ছিল বলে তিনি তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন। তাঁর রচনার এক সিংহভাগ ইসলামী আদর্শবাদ ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। মূলত বিংশ শতাব্দীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ উপমহাদেশের বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর আন্দোলনে তিনিই অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। মুসলিম জাতিসত্তার নয়া উদ্বোধক তিনিই। তিনিই প্রথম কবি যিনি মুসলিম জাতিসত্তার, ঐতিহ্যের ও আদর্শের সার্থক উপস্থাপক। তাঁর ইসলামী কবিতা ও গান আজো তুলনারহিত ঃ

উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক
শহীদের দিনে সব লালে লাল হয়ে যাক।

(মোহররম)

এভাবে ইসলামী জাগরণমূলক কবিতার অনেক উদাহরণ পেশ করা যাবে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁকে বাঙালি মুসলিম জাতিসত্তার প্রাণপুরুষ ও সার্থক দিকদিশারী বলা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক কবির মর্যাদায় আসীন। তিনি মাটির কোলে বেড়ে উঠে মাটি ও মানুষের কথা চিন্তা করেছেন, চিন্তা করেছেন সামাজিক অন্যায় ও অসত্যের প্রতিকারের কথা। সামাজিক সমস্যাকে তিনি কাব্যের উপজীব্য করেছেন। মোটকথা সকল সামাজিক অনুষঙ্গ একযোগে তাঁর রচনার মৌলিক বস্তুগত কাঠামো বিনির্মাণ করেছে। একজন সামাজিক বিজ্ঞানীর কাজও তাই। তিনি সব সময় সামাজিক সমস্যাকে উদ্‌ঘাটন করতে থাকেন। এটা তাঁর মূল দায়িত্ব। প্রতিকারচিন্তাও।

আমরা আগেই বলেছি, নজরুল তত্ত্বগত পদ্ধতির কোন তত্ত্ব দেননি, কিন্তু তত্ত্বের মূল সুরকে আত্মস্থ করে কাব্য রচনাতে তা প্রয়োগ করেছেন। এখানেই কবির মহত্ত্ব। নজরুলের রচনা অর্থনৈতিক সুবিচারভিত্তিক সাম্যনীতির সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক। তবে সে সাম্যবাদী ব্যবস্থা কার্ল মার্কসীয় সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে বিনির্দেশ করে না, যদিও কবি রুশ বিপ্লবের পর পরই তাঁর অমর গ্রন্থগুলো রচনা করেন। তবে প্রভাব যে একেবারে ছিল না, তা নয়, ছিল। তৎকালীন ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল, ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের তৎপরতার সাথে যোগাযোগ। তাঁর সাম্যবাদী দর্শন অনেকাংশে ইসলামী

দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। নজরুলের সুবিধা ছিল এই যে, তিনি সব মতাদর্শের সাথে পরিচিত থেকে অন্তর্দৃষ্টির অভিক্ষেপণ প্রয়োগে নিজস্ব চিন্তাধারার ভুবন তৈরি করতে পারতেন। করেছিলেনও তাই।

নজরুলের সামাজিক কর্মসূচী ঃ

অগ্নিবীণার বিদ্রোহী, প্রলয়োল্লাস, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, সাম্যবাদী, সর্বহারাসহ অসংখ্য সুবিখ্যাত কবিতা আর শেকল ভাংগার গান লিখে নজরুল বাংলা সাহিত্যাকাশে এক অসম্ভব আলোড়ন ও তোলপাড় তুললেন। নজরুলকে হিন্দু-মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে এলবার্ট হলে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা দেয়া হলো। সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি নাড়া দিলেন এক হ্যাচকাটানে। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ নিরসনে অনর্গল লিখতে লাগলেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেও ক্ষান্ত হলো না, তাঁর লেখা বাজেয়াপ্ত করল। কিন্তু নজরুল নিজের দেশ-কাল-সমাজ-জাতিকে চিনেছিলেন এমনভাবে যে সমাজের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্তব্ধ হতে চাইলেন না। তিনি বৃটিশ সরকারের শাসন, তাদের সৃষ্ট দেশী-বিদেশী আমলাতন্ত্রের কাঠামোকে বৃটিশের দাসত্বের এক সুশৃঙ্খল চেইন বলে শনাক্ত করলেন এবং পাশাপাশি দেশীয় বৃটিশ তাবেদার শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের তুবড়িবাজি নিরীক্ষণ করে এদের অসারতা সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চিত হলেন। তিনি দেখলেন তাঁর ডাকে মানুষ সাড়া দিলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় তারা অংশ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ চিন্তা থেকে নজরুল দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে আপামর জনগণকে তাতে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপাত্র হিসেবে তিনি 'লাঙল' পত্রিকা বের করেন।

এ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হলো যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্যলাভই দলের উদ্দেশ্য। কি উপায়ে সে উদ্দেশ্যে সাধিত হবে ? বলা হলো যে, নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগ উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হবে। দেখা যাচ্ছে তিনি

নিয়মতান্ত্রিক নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগকেই দলের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলেন। কোন সন্ত্রাসবাদ, অসহিষ্ণুতা, অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ তাতে নেই। বিদেশী আমলাতন্ত্র দ্বারা যে সমাজের কোন লাভ হবে না তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং এ বিবেচনায় দলের ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত সম্মতি ব্যতীত সরকারের অধীনে দলের কোন প্রতিনিধির চাকুরি গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়।

দলের কর্মনীতি ও সংকল্পের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জমিতে কৃষকের স্বত্ব ও স্বার্থ ঘোষণার দাবী। তাঁর মতে ভূমির স্বত্বে স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বত্বাধিকার বা মালিকানা না থাকলে অন্য সমস্ত অধিকার ভোগে সুখ আসতে পারে না এবং ভুমির স্বত্বাধিকার ব্যতীত এর শুধু ভোগাধিকার ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য, দেশ ভাগের পরে ১৯৫০ সালে এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সি এ্যাক্ট পাশ ও বলবৎ হওয়ার পর বাংলাদেশের কৃষককুল জমির স্বত্বাধিকারী হয়। নজরুল যে কত বড় দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান চিন্তানায়ক ছিলেন তা এ ঘটনা থেকে সহজেই প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য, তাঁর এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন তিনি তাঁর সুস্থাবস্থায় দেখে যেতে পারেননি।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের কর্মনীতি ও সংকল্প সমাজের স্তূপীকৃত সমস্যার প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছিল এবং এর উল্লেখযোগ্য অনেক কর্মসূচী ছিল যা সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। ইস্তেহারে শ্রমিকের অধিকার, কৃষকের অধিকার সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, নজরুল জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং তিনি প্রায় সারা বাংলা সফর করেছেন। নজরুল যে স্বপ্নচারী, আকাশচারী কোন কবি ছিলেন না, বরং তিনি যে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক ও সমাজ চিন্তাবিদ ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী পর্যালোচনায় এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

নজরুলের বাঙালি ও বাংলাদেশ বীক্ষণ ঃ

নজরুল বাঙালির জাতীয় কবি ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এজন্যে যে, তিনি বাংলার

মানুষের প্রাণের কথা, মনের কথা অত্যন্ত খোলামেলাভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি আধুনিক বাংলাদেশের জন্মের অনেক পূর্বেই বাংলার জনগণের শক্তিমত্তা ও অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা বারবার বলেছিলেন। তাঁর ভাষায় বাংলার ধন-সম্পদের কোন অভাব ছিলনা, কিন্তু বিদেশীদের দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনের অবাধ শিকারে পড়ে বাঙালি সম্পদহারা হয় আর বাংলাদেশ দরিদ্র হয়ে পড়ে। কিন্তু এতকিছুর পরও বাঙালি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে ওঠে তাহলে তার নবজাগৃতি অনিবার্য। তাঁর ভাষায় ঃ

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে -- 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্টসেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একেবারে নেই বলে তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্মবিমুখতা, জড়তা, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনাশক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। আমাদের অভাব কোথায় ? অতিপ্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশী লুটে নিয়ে যায়। আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না উল্টো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লিখায় লিখিত।

.... তার (বাংলার) সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না, এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু একে স্পর্শ করবে --- তাকে প্রহারেণ

ধনঞ্জয় দিয়ে বিনাশ করবো, সংহার করবো। বাঙালিকে বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও ঃ

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির - আমাদের
দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়
তাড়াব আমরা, করিনা ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
রামাদের গামাদের।।"
বাঙলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক!

(বাঙালির বাঙলা)

উক্ত প্রবন্ধে নজরুল বাংলার সমস্যা তথা বাঙালির কি সমস্যা ছিল তার ওপর আলোকপাত করেছেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি তার আপন ঠিকানা খুঁজে নেয় এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। কিন্তু আজো আমরা দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে পারিনি। নজরুল যে বলেছিলেন অবিদ্যা অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় এটা সত্য কথা।

এখানো আমাদের সিংহভাগ লোকই অশিক্ষিত। উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায় হয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি সত্য; কিন্তু এখনো আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইনি। এখানো আমাদের অর্থনীতি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট। বিদেশ থেকে ভিক্ষার ঝুলি ভরে আমরা আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছি। নজরুল বলেছিলেন যে, বিদেশী দুস্যরা আমাদের সম্পদ ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। কথাটি আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থ ও খাদ্য সাহায্যের নামে বিদেশী সাহায্য সংস্থা ও দেশসমূহ কঠিন কঠিন শর্তারোপ করছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর। সাহায্য যা পাওয়া যাচ্ছে তার সিংহভাগই আবার কনসালটেন্সিসহ বিভিন্ন কায়দায় বিদেশী সংস্থা ও দেশ দস্যুতা করে, ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। মোটকথা এখনো সমানহারে দস্যুবৃত্তি বলবৎ রয়েছে। সুতরাং নজরুলের বাঙালি ও বাংলাদেশ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, আজকের সমাজবাস্তবতার সাথে তার বহুলাংশেই মিল

রয়েছে। বাংলার সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা যথার্থ অর্থেই যেন দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত।

কালঘনিষ্ঠতা

নজরুলের উপন্যাস, ছোটগল্প, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, নাটক, প্রবন্ধ, অভিভাষণ ইত্যাদি লেখা থেকে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ব্যাপক পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে এবং তা গবেষণার দাবী রাখে। আলোচ্য নিবন্ধে খুবই সীমিত পরিসরে তাঁর রচনার ওপর আলোচনা করা হলো। তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের চিন্তাধারা নিয়েও ব্যাপক গবেষণা করা যায় যেখানে আমরা দেখি তিনি 'ধুমকেতু', 'গণবাণী', 'লাঙ্গল' সহ বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এসব পত্রিকায় স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জ্বালাময়ী নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের চিন্তাধারার আলাদা এক জগৎ এখানে পাওয়া যাবে।

বলা বাহুল্য, নজরুলের সামাজিক চিন্তাধারার প্রভাব তৎকালীন সাহিত্যাকাশে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল, এখনো হচ্ছে, আগামীতেও হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর কবিতা ও গান এদেশবাসীর অন্তরের জিনিষ বলে প্রতিভাত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কবিতা, গান ও রচনা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। নজরুল ব্রিটিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটক কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। শুধু তাই নয়, নজরুলের মুক্তচিন্তা ও মুক্তকণ্ঠের বাহন 'ধূমকেতু' পত্রিকাকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্বকবি লিখলেন ঃ

আয় চলে আয়রে 'ধুমকেতু'
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দূর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা,

জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

নজরুল পরাধীন ভারতের মানুষের মনের কথা লিখেছিলেন। তাই তিনি জনগণের অপরিসীম ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান পেলেন, পেলেন গণসংবর্ধনা দেশের মানুষের পক্ষ থেকে। জীবদ্দশায় তিনি এতবেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন যা আর কোন কবির ভাগ্যে জোটেনি। তিনি বিপুল বেগে এলেন এবং জয় করলেন মানব হৃদয়। কারণ ওই একটাই, সমাজ সংশ্লিষ্টতা, মানবগহনে বসবাস ও এর অনুপম ইহজাগতিকতা। নজরুল তাই অজেয়, কালোত্তর।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীদের মতো পদ্ধতি অনুসরণ না করেও নজরুল তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ যথার্থভাবে অনুধাবন করে তা তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের সমস্যা ও সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন যা নজরুল অনুসরণ করেছিলেন। সামাজিক নানাবিধ স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ, দারিদ্র্যের মুখোশ উন্মোচন, পরাধীনতার জাল ছিন্নকরণ, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন --- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনের দিক নির্দেশনা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিনাশন, নারীর প্রতি অযৌক্তিক অবরোধের বিলোপন, সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন এবং আত্মমর্যাদাশীল স্বাধীন জাতিসত্তার উদ্বোধনসহ সামগ্রিক সমৃদ্ধিতে নজরুলের সৃষ্টিসম্ভার শুধু বাংলায় নয়, বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

তথ্য নির্দেশিকা

নজরুল ইসলাম, কাজী (১৯৮৫), *সঞ্চিতা।* ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স।

মান্নান সৈয়দ, আব্দুল (১৯৮৭), *নজরুল ইসলাম ঃ কালজ কালোত্তর।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

আব্দুল হাই, মুহম্মদ ও আলী আহসান, সৈয়দ (১৩৯৫), *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ (আধুনিক যুগ),* ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ।

আব্দুল হাকিম, শেখ (১৯৮৭), *নজরুল সাহিত্যে মানবতা ও ধর্ম।* ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

নজরুল ইসলাম, কাজী (১৯৯৬), *নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

নজরুল ইসলাম, কাজী (১৯৯৬), *নজরুল রচনাবলী (৪র্থ খন্ড)।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), *নজরুল ইসলামের সাহিত্যজীবন।* ঢাকা ঃ মুক্তধারা।

Islam, Rafiqul (1990), ***Kazi Nazrul Islam a new anthology.*** Dhak : Bangla Academy.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ঃ ধারণাগত বিভিন্নতা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মোঃ রিয়াজুল হক*

Dependency Theory : Conceptual Difference and Bangladesh Perspective

Md. Riazul Huq

Abstract : Dependency is, absolutely and undoubtedly a historical concept, specially in a democratic country like Bangladesh. Bangladesh is a country of third world, achieved independence in 1971 through a indelible struggle with Pakistan. Thenceforth, Bangladesh has considered in the world as a democratic nation. Notwithstanding a democratic country it cannot refrain herself from dependency. Dependency is not praiseworthy, it's nothing but blameworthy. And however an undemocratic reign develops dependency and destroys self-consciousness. Apart from this, it creates some undesirable situation, which cannot bring a fruitful result for a country for instance, dependency develops foreign culture, create political instability, ill economic condition and eventually destroys human nature which accelerates the dependency also. This paper attempts that dependency theory: conceptual difference and Bangladesh perspective.

* প্রভাষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

পঞ্চাশ দশক থেকে অনুন্নত দেশগুলিকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশের ন্যায় উন্নত করার লক্ষ্যেই উন্নয়নের আধুনিকীকরন মডেল প্রবর্তিত হয়। এ মডেলের কেন্দ্রবিন্দু হল পুঁজিগঠন ও প্রবৃদ্ধির হার উদ্দীপিত করা । নির্ভরশীলতা তত্ত্ব উপরোক্ত মডেলেরই সমালোচনা ও বিকল্প ব্যাখ্যা। নির্ভরশীলতা তত্ত্বটি গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বিকশিত হতে শুরু করে। নির্ভরশীলতার ধারণাটি মূলতঃ ল্যাটিন আমেরিকার আলোকে গড়ে উঠে। বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার পরিধি ছাড়িয়ে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বিভিন্ন দিক এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা আলোচ্য আলোচনায় ব্যক্ত করার প্রয়াস পাবে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব - ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

গত শতাব্দীর ষাট, সত্তর ও আশি দশকে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন পল ব্যারেন ১৯৫৭ সালে তার The Political Economy of Growth শীর্ষক গ্রন্থে। এই ধারণার দিক নির্দেশকগণ হলেন - রাউল প্রেবিশ, সুনকেল, ফুর্তাদো, সন্তোষ, আর এম মারিনি, আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক, আরিঘিরি ইমানুয়েল, সমীর আমিন প্রমুখ। তাঁরা মনে করেন আজকের সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অনুন্নত ব্যবস্থা বিরাজ করছে তা এসব দেশের আদি বা সনাতন প্রকৃতির কারণে নয় বরং তা ঘটেছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় - প্রথম বিশ্ব উন্নত হয়েছে তারই ফল হিসাবে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বের উপর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাঠামোগত নির্ভরশীলতার কারণেই তৃতীয় বিশ্বে অনুন্নত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মেই অনুন্নত দেশগুলোর উপর উন্নত দেশ গুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো প্রাক পুঁজিবাদী দেশগুলোকে শোষণ করছে। মূলতঃ

পুঁজিবাদের বিকাশ, একচেটিয়া তন্ত্রের রূপান্তর এবং সাম্রাজ্যবাদের রূপলাভ সংক্রান্ত লেনিনের ধারণা নির্ভরশীলতা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব মোট ২টি ভাব ধারার সন্ধিস্থল থেকে উৎসারিত,

- প্রথমটি ঃ নয়া মার্কসবাদ
- দ্বিতীয়টি ঃ CEPAL অথবা ECLA

নির্ভরশীলতা মূলতঃ উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ ফল। কেননা এই নির্ভরশীলতা বিদ্যমান কাঠামো ঔপনিবেশিক শোষণের প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রাখে এবং নতুন কলাকৌশলের মাধ্যমে শোষণের গ্রন্থিগুলোকে সুসংহত করে তোলে। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের মূল্যায়ন করা সম্ভব। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের/প্যারাডাইম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, The dependency school emerged from the convergence of two intellectual trends: one often called ‘neo-Marxism’ and the other rooted in the earlier Latin American discussion of development that ultimately formed the ECLA tradition.[১] একই ধরনের বক্তব্য এসেছে অন্যত্র - The dependency school emerged from the convergence of two major traditions which in turn contained several theoretical orientations. Classical Marxism, Marxism - Leninism, Neo-Marxism, the other rooted in the Latin American structuralist discussion on development which ultimately formed the CEPAL tradition.[২]

---

[১] ইমাম. মোহাম্মদ হাসান - উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ (সম্পাদিত)। কাফি বিল্লাহ ৩৩৫ পশ্চিম রামপুরা। ঢাকা-১২১৭। সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। পৃষ্ঠা-২৮৮।

[২] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৮৯।

নির্ভরশীলতার সংজ্ঞা ঃ ষাটের দশকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব ও উন্নয়নের অধ্যয়নের জগতে নির্ভরশীলতা প্রত্যয় সংযোজিত হয়। অনেকে এ সম্পর্কীয় লেখাগুলোকে একটি তত্ত্ব, আবার তত্ত্বসমূহ এবং কেউবা স্কুল/পারসপেকটিভ /প্যারাডাইম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তত্ত্ব হিসাবে নির্ভরশীলতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে। [Dependency is] A set of theories which maintained that the failure of Third world states to achieve adequate and sustainable levels of development resulted from their dependence on the advanced capitalist world .... Dependency theories clams of modernization theories which saw the less developed countries being able to catch up with the west...[৩]

নির্ভরশীলতা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্ব একধরনের নির্ভরশীল সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী অধঃস্তন অবস্থায় পতিত থাকে। অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে নির্ভরশীলতা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

The state of being connected to and subordinate to someone or something. The opposite of self reliance, this term may be encountered in a variety of sociological context. In the study of economic growth and the society of development it describes a situation in which less developed countries (LDCs) literacy, depend on imports from the advanced industrial states, in order to achieve growth. This can take the form of financial and technical aid, expertise, or military support. Dependency is judged by so-called dependency theorists and others, to be a limiting condition to the long-term economic and political interests of third world states.....[৪]

দস্ সন্তোষের নির্ভরশীলতার সংজ্ঞায় বিশেষভাবে উল্লেখিত হতে দেখা যায়ঃ Dependence is a conducting situation in which economics of one group of countries are conditioned by the development and expansion

---

[৩] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৯০
[৪] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৯০

of others. A relationship of interdependence between two or more countries or between such countries and the world trading system becomes a dependent relationship when some countries can expand through self-impulsion while others, being in a dependent position, can only expand as a reflection of the expansion of the dominant countries, which may have positive or negative effects on their immediate development.[৫]

নির্ভরশীলতার ধারণা ব্যক্তিভেদে সামান্য আলাদা প্রতিভাত হতে পারে। সেদিক বিবেচনা করে এখানে চূড়ান্ত সংজ্ঞা প্রদান করা সুকঠিন।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মৌলিক অনুমান সমূহ ঃ

১. গতানুগতিক নিয়মানুসারে কেন্দ্র (উন্নত রাষ্ট্র) সকল বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের নিয়ম পরিবর্তন করে। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধনতান্ত্রিক বিরোধী কার্যক্রমে প্রান্তের (উন্নত দেশ সমূহের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র) অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

২. কাঁচামাল রপ্তানী ও উৎপাদন বৃদ্ধির মানসে অতিরিক্ত শ্রম বিনিয়োগ পরিধিস্থ (উন্নত দেশ সমূহের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র) দেশগুলোর অর্থনীতিকে বিস্তৃত করে ফেলেছে।

৩. কেন্দ্র ও পরিধিস্থ দেশগুলোর এলিট শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সেতুবন্ধন ও যোগাযোগ দ্বারা পরিধিস্থ দেশগুলোর স্বাধীন উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৪. আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও পুঁজির অনুপ্রবেশ বিশ্ববাণিজ্যে অসম বিনিময় এবং বিশ্ব বানিজ্য কর্তৃক আরোপিত আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কেন্দ্রে কাঁচামাল সরবরাহ করছে এবং কেন্দ্রস্থ দেশগুলোর Finished goods এর বাজার হিসাবে ভূমিকা পালন করছে।

৫. বহুজাতিক কোম্পনীগুলোর পুঁজি কেন্দ্রিক প্রযুক্তি ও স্থানীয় এলিটদের কায়েমী স্বার্থের পক্ষে। ফলে শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে

---

[৫] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৯১

নিজেদের আয় বাড়িয়ে নেয়া হয় এবং কোন কোন রাষ্ট্রের আয় বন্টনকে জটিল করে তোলে।

৬. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নির্ভরশীলতা লক্ষণীয়ভাবে প্রযোজ্য।

৭. নির্ভরশীলতা একটি দেশের জন্য অবশ্যম্ভাবী শর্ত যা উন্নত দেশগুলো থেকে আরোপিত।

৮. নিরীক্ষাগত দিক থেকে এটি একটি অর্থনৈতিক শর্ত, যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাময়িক ভূমিকা রাখে।

৯. নির্ভরশীলতাকে বৈশ্বিক অর্থনীতির আঞ্চলিক মেরুকরণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১০. নির্ভরশীলতা উন্নয়নের প্রতিযোগিতা নয়।

নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিকদের তত্ত্বসমূহ ঃ

রাউল প্রেবিশ ঃ নির্ভরশীলতার ধারণা প্রথম উত্থাপন করেন রাউল প্রেবিশ। ১৯৪৮ সালে ল্যাটিন আমেরিকা সংক্রান্ত জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক কমিশন (United Nations Economic Commission for Latin America - ECLA) গঠিত হবার পর এই কমিশনের পক্ষ থেকে সেক্রেটারী জেনারেল রাউল প্রেবিশ একটি তথ্যমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। প্রেবিশ তার রিপোর্টে ল্যাটিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার আলোকে অনুন্নত দেশ সমূহের বাণিজ্যিক প্রতিকূলতার চিত্র তুলে ধরেন। রাউল প্রেবিশ ECLA'র দায়িত্ব গ্রহণ করে চিলির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেন এবং চিলির অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করেন যে, সেখানে তামা ও অন্যান্য কাঁচাপণ্যের তুলনায় প্রস্তুত পণ্যের দাম অনেক বেশী বেড়ে যাচ্ছে। ১৯২৫-৩০ এর তুলনায় ১৯৫০-৫৩ সালে চিলির আমদানী ক্ষমতা ৪০% হ্রাস পেয়েছিল। যদিও চিলির রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ছিল কিন্তু আমদানী করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল। ল্যাটিন আমেরিকার পটভূমিতে প্রেবিশ এই প্রবনতা লক্ষ্য করলেন। তাঁর মতে, বিশ্ব অর্থনীতির পক্ষে মৌলিক দ্বিভাজন রয়েছে। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত কিছু দেশ উৎপাদন বাজার যোগাযোগ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। অনুন্নত দেশগুলো এই কেন্দ্রের প্রান্তে অবস্থিত। প্রান্তিক দেশগুলোর অর্থনীতি কাঠামোগতভাবে কেন্দ্রের অর্থনীতি থেকে ভিন্ন অথচ আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক দেশগুলো কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার কাঠামোয় ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নের পন্থা হিসাবে তিনি নির্দেশ করলেন অন্তর্মূখী উন্নয়নের নীতি যার ভিত্তি হচ্ছে আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন। প্রেবিশ এ ক্ষেত্রে যে তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করেছেন পরবর্তীকালে নির্ভরশীলতা প্রতিকল্পের ভিত্তি হিসাবে তা পরিগণিত হয়।[৬]

জন গালতুং ঃ জন গালতুং centre periphery' র মাধ্যমে নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নরওয়ের জন গালতুং আন্তর্জাতিক সংঘাতের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কাঠামোগত অসমতা ও শোষণমূলক সম্পর্কে চিহ্নিত করেন এবং এর ভিত্তিতেই তিনি কাঠামোগত সহিংসতা (Violence) প্রত্যয়টি প্রবর্তন করেন। জন গালতুং এর Centre Periphery Concept টি নিম্নে চিত্রাকারে দেখানো হলো ঃ

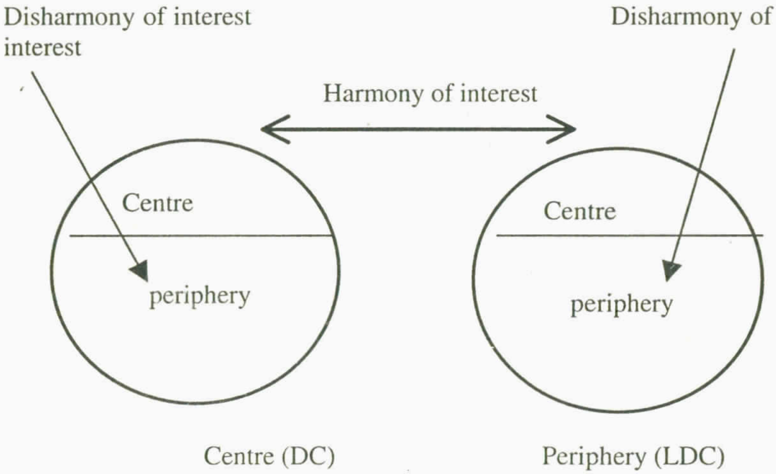

চিত্র - ১ ঃ Centre - Periphery Relationship

উৎস ঃ Dependency theory and the Third world with special reference of Bangladesh - Md. Shamim Ahsan, রাষ্ট্র বিজ্ঞান দর্পণ, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৭৮।

[৬] হোসেন, ফেরদৌস-নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ঃ ধারণাগত বিভিন্নতা, রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল। জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩। পৃষ্ঠা-২২।

এই ধরনের সহিংসতার উৎস হচ্ছে সামাজিক কাঠামো। সুতরাং সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনতে না পারলে এ সহিংসতার অবসান ঘটানো যাবে না। কেন্দ্র-প্রান্তিক রাষ্ট্রে এলিট তৈরী করে এই আধিপত্য বজায় রাখে।

পল ব্যারান ঃ Monthly Review Group এর সদস্য পল বারান তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং তার ব্যাখ্যার ফলে নির্ভরশীলতার ধারনা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্যারান উদ্বৃত্তের ধারণাকে ব্যবহার করেন। তিনি অনুন্নত দেশে পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উপনিবেশ থেকে উদ্বৃত্ত অপসারণ করছে এবং সেই উদ্বৃত্ত দ্বারা নিজ দেশের পুঁজির চাহিদা পূরণ করছে। এর ফলে উপনিবেশগুলোর উদ্বৃত্ত পুঁজি উপনিবেশে পুনর্নিয়োগ না হবার কারণে উপনিবেশ গুলোর উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বিপরীতে সৃষ্টি হয়েছে অনুন্নয়ন। ব্যারান বলেছেন এই অনুন্নত দেশগুলোও উদ্বৃত্তহীন নয়। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোর উদ্বৃত্তের ব্যবহার এমন যে, তা উৎপাদনে পুনর্বিনিয়োগ ও আত্মবিকাশমান শিল্পের প্রসার ঘটাতে পারছে না। কেননা এই উদ্বৃত্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয় উন্নতদেশসমূহে পাচার হয়ে যাচ্ছে অথবা সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপরও যেসব দেশে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে যায় তাও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও সংকুচিত অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতিকূলতর জন্য বিনিয়োজিত হতে পারছে না। ব্যারান মনে করেন, অনুন্নত দেশগুলোতে বিদেশী পুঁজির উপস্থিতির কারণে স্বাধীন শিল্প বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং বিদেশী পুঁজির সাথে সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী মুৎসুদ্দী শ্রেণী গড়ে উঠায় তাদের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থ সুনিশ্চিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ব্যারান অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের শর্ত হিসাবে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা হতে বিছিন্ন হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন।[৭]

[৭] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৩

ফারটাডো ঃ ফারটাডো তাঁর Economic Growth of Britiain ও Economic Development of Latin America গ্রন্থ দুটিতে নির্ভরশীলতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন - বৈশ্বিক ধনতন্ত্র অধ্যুষিত দেশগুলিকে নির্ভরশীল করে তোলে। তিনি বলেন এসব দেশগুলোর সমাজ কাঠামো এর জন্য মোটেও দায়ী নয়। তাঁর মতে দেশগুলোতে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী ও চাকুরীজীবীরা এত শক্তিশালী নয় যে, তারা এই অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজনীতি থেকে মুক্তি লাভ করবে। তাদের এই অক্ষমতার জন্য শাসকশ্রেণী দেশের উন্নয়নের জন্য কোন অবদান রাখতে পারছে না। ল্যাটিন আমেরিকার দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির শাসক শ্রেণীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব দেশের উন্নয়নীতি ও সুষম উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে এক বাধাস্বরূপ। ফলে দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে পর্যুদস্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের দারিদ্র বেড়ে যায় এবং সে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ প্রান্তিক দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হয়। এটাই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের সমস্যা। তাদের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কারণে এই সব দেশগুলোতে বৈদেশিক ধনতন্ত্রের প্রভাব বাড়ছে, সাহায্য সহযোগিতার নামে। ফলে এইসব দেশ হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল।[৮]

ডেভিড সুনক্যাল ঃ ডেভিড সুনক্যাল চিলির একজন অর্থনীতিবিদ। তাঁর বক্তব্য হল বহুজাতিক কর্পোরেশন গুলো বৃহৎ কৃৎকৌশল উন্নতদেশ থেকে অনুন্নত দেশে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অনুন্নত দেশ থেকে কাঁচামাল পাঠাচ্ছে উন্নতদেশগুলোতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কর্পোরেশন গুলো অনুন্নত দেশগুলোকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক উন্নত করে তুলছে কিন্তু আসলে তা নয়। আসলে তারা বিলাস দ্রব্যের প্রযুক্তি হস্তান্তর করে যা এদেশ সমুহের প্রকৃত চাহিদা নয়। আবার প্রযুক্তির সম্পূর্ণটাও হস্তান্তর করে না। উন্নতদেশগুলো অর্থাৎ ধনতান্ত্রিকদেশগুলো কখনই অনুন্নত দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি হস্তান্তর করে না। যেমন কৃষি প্রধান দেশগুলোতে কৃষির উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করে না। কারণ এতে ঐ দেশগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। চাহিদানুযায়ী প্রযুক্তি

[৮] ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ - সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা। আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ৬০।

পাওয়া যায় না বলেই অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল থেকেই যায়। সুনক্যালের মতে, বহুজাতিক কোম্পানী গুলো Buffer State এর ভূমিকা পালন করে এবং এই কোম্পানীগুলোর মাধ্যমেই বৈশ্বিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে তাদের উপর নির্ভরশীল রাখে। তিনি বলেন উন্নত দেশগুলো সরাসরি এসব দেশে প্রবেশ করতে পারে না, তাই তারা বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের নাম করে এসব দেশে অনুপ্রবেশ করে এবং একসময় তাদের বাজার সৃষ্টি করে। পরে বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা নিজের দেশে পাচার করে।[৯]

সুনকেল একটি মডেল তৈরী করেন যার মাধ্যমে তিনি উন্নত বিশ্বের শোষণ প্রক্রিয়া এবং নির্ভরশীলতা তৈরীর কৌশল তুলে ধরেন। নিম্নে তাঁর মডেলটি উল্লেখ করা হল ঃ

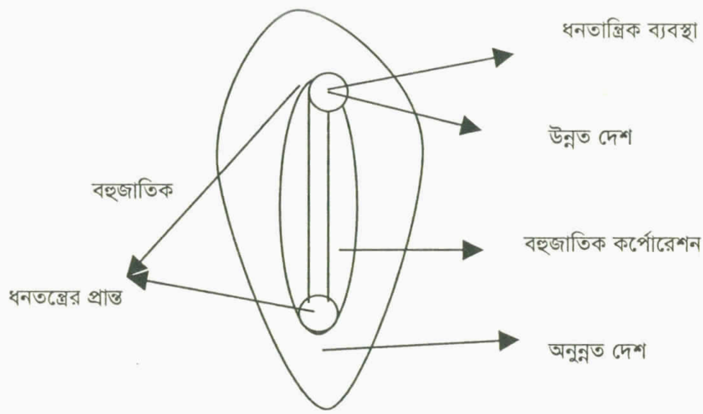

চিত্র - ২ ঃ সুনক্যালের মডেল

উৎস ঃ সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা, মোঃ আব্দুল ওদুদ ভুঁইয়া - পৃষ্ঠা ৬১

সমীর আমিন ঃ আফ্রিকার চিন্তাবিদ সমীর আমিন তাঁর Unequal Development গ্রন্থে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরেন।

[৯] প্রগুক্ত পৃষ্ঠা - ৬০-৬১।

প্রথমত ঃ প্রান্তিক পুঁজিবাদে উত্তরণ কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদে উত্তরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদ কর্তৃক প্রাক পুঁজিবদি কাঠামোর ওপর বাইরের থেকে সৃষ্ট অভিঘাত পশ্চাৎপদতার কারণ ঘটায়। আমিন মনে করেন সমকালীন তৃতীয় বিশ্বের কৃষি সংকট এ ধরনের অনগ্রসরতার ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয়তঃ প্রান্তিক পুঁজিবাদ "একস্ট্রাভারসন" দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যেখানে রফতানীমুখী কর্মকাণ্ডের বিকৃতি লক্ষণীয়। স্থানীয় বাজারের অসম্পূর্ণতা থেকে এটি হয় এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উচ্চ উৎপাদনশীলতার কারণে এটি ঘটে। আমিন বলেন "extraversion does not result from inadequacy of the home market but from the superior productivity of the centre is all fields, which compels the periphery to confine itself to the role of complementation supplier of products for the production of which it possesses a natural advantages : exotic agricultural produce and minerals." এই ধরনের বিকৃতির কারণে প্রান্তের মজুরী কেন্দ্রের চেয়ে কম।

তৃতীয়তঃ আরেক ধরনের বিকৃতি হল তৃতীয় পর্যায়ের সেক্টরের স্ফীতি। কেন্দ্রে এ ধরনের ঘটনা একচেটিয়া পুঁজিবাদে উদ্বৃত্ত মূল্যের সংস্থান কঠিন করে দেয়। ফলে বিপণন ও পণ্যের হিসাব রক্ষণের জন্য বেশী সম্পদ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু প্রান্তে এ ধরনের ঘটনা প্রান্তিক পুঁজিবাদের অন্তর্গত স্ববিরোধিতার ফলশ্রুতি যেমন - শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শিথিলতা ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, গ্রাম - শহরের অভিগমনের মত সমস্যার সৃষ্টি করে।

চতুর্থতঃ বিনিয়োগের মাধ্যমে বহু গুণিতক প্রভাব তত্ত্বকে ব্যাপক সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। বিদেশী বিনিয়োগজাত মুনাফা রফতানীর কারণে কেইনসীয় বহুগুণিতক তত্ত্ব বরং কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কাজ করে, প্রান্তে নয়।

পঞ্চমতঃ আমিন গবেষকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তারা যেন অনুন্নত দেশগুলোকে বর্তমানের উন্নত দেশগুলোর সাথে এক করে না দেখেন। কারণ তারা উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। এ অবস্থার জন্য দায়ী তাদের কয়েকটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ঃ

- The extreme unevenness that is typcal of the distribution of productivity at the periphery.

- disarticulation due to the adjustment of the orientation of production at the periphery to the needs of the center; and
- economic domination by the center which is expressed in the forms of trade and financial dependence.

ষষ্ঠত ঃ এর কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রান্তের দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রান্তিক পুঁজিবাদ autocentric ও autodynamic অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয় না যতক্ষণ তারা বৈদেশিক একচেটিয়াবাদ, আধিপত্যবাদ ও কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

শেষত ঃ প্রান্তিক গঠনসমূহ কি ধরনের বিশেষ অনুন্নয়নের রূপ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করে কয়েকটি জিনিসের উপর।

- The nature at the pre-capitalist formation that was there previously and
- The forms and the periods in which the peripheries were integrated into the capitalist worlds system.

অবশ্য প্রান্তিক দেশসমূহের পার্থক্যকে অবজ্ঞা না করলেও আমিন বলেন - all trends to coverage toward a typical model, characterized by the dominance of agrarian capital, comprador or commercial capital, and central capital সবকিছুর উপর কেন্দ্রীয় পুঁজির আধিপত্যের মডেল প্রান্তিক জাতীয় পুঁজিবাদের বিকাশ সীমিত করে দেয়।[১০]

দোস সানতোস ও মারিনি ঃ- ব্রাজিলের নাগরিক থিওটোনিও দোস সানতোস চিলির অভিজ্ঞতার আলোকে ল্যাটিন আমেরিকার পরিবর্তিত বাস্তবতা বোঝাতে গিয়ে নতুন নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। এই প্রত্যয় এর মাধ্যমে তিনি ECEL এর আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন নীতির ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। নতুন নির্ভরশীলতা বলতে তিনি ল্যাটিন আমেরিকায় উত্তর আমেরিকার বিনিয়োগের পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধির

---

[১০] ইমাম, মোহাম্মদ হাসান (সম্পাদিত) কাফি বিল্লাহ ৩৩৫ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৭। পৃষ্ঠা - ৩০৪-৩০৫।

বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর গবেষণায় প্রতিভাত হয় যে, যেখানে কাঁচামাল উৎপাদনেই উত্তর আমেরিকার বিনিয়োগকারীদের প্রধান মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল, সেখানে পরবর্তীতে শিল্পখাতে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স শিল্পে বেশী বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে প্রান্তস্থ দেশগুলি শুধুমাত্র কাঁচামাল রপ্তানীর জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে না বরং এদেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে আরও ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ছে। সানতোসের মতে, এই প্রক্রিয়ায় নতুন আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। দোস সানতোস সমস্যাটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিন ধরনের নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করেন: (১) ঔপনিবেশিক নির্ভরশীলতা (২) আর্থিক নির্ভরশীলতা (৩) প্রযুক্তি শিল্পগত নির্ভরশীলতা। দোস সানতোসের নতুন নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে। তাঁর মতে, নির্ভরশীলতা মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের ফলশ্রুতি এবং এর ফলে পুঁজিবাদী বৈশ্বিক উন্নয়ন অসম প্রকৃতি ধারণ করে। একারণে প্রান্তিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে না।[১১] নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অপর একজন ব্রাজিলিয়ান রূপকার হলেন মারিনি।[১২] তিনিও চিলির উপর গবেষণা করেছেন। মারিনি তাঁর বিশ্লেষণে উন্নত বা কেন্দ্র রাষ্ট্রের পুঁজিবাদের প্রকৃতি এবং অনুন্নত বা প্রান্তস্থ রাষ্ট্রের পুঁজিবাদের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে প্রান্তস্থ দেশ সমূহের অর্থনীতি বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত এবং এ কারণে এ সব দেশের অর্থনৈতিক উৎপানের মূল লক্ষ্যই থাকে রফতানী। মারিনি দেখিয়েছেন যে, এদেশগুলোর শ্রমিকরা কম মজুরীতে বাইরের বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে। ফলে নিম্ন মজুরী হারের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে স্থবিরতা দেখা দেয়। মারিনির মতে, প্রান্তস্থ দেশ গুলোর অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে যেহেতু শিল্প উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই, তাই এসব দেশে 'অতি শোষণ' বিস্তার লাভ করে। এজন্য প্রান্তস্থ রাষ্ট্রে অবধারিতভাবে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। মারিনি এ প্রেক্ষাপটে 'উপ সাম্রাজ্যবাদের' ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব অনুসারে বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ যেমন -

---

[১১] Dos, Satos - Dependency Relations and Political Development in Latin America: Some Considerations in
Ibero - America: Vol-11, No.-1.

[১২] Magnus Blomstrom and Bjorn Hettne Development Theory in Transition, London - 1980, P.P - 56-60.

পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর তেমনি উপসাম্রাজ্যবাদ হল নির্ভরশীল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর।

আরঘিরি ইমানুয়েল ঃ ইমানুয়েল মতে, বাণিজ্যিক লেনদেনের অসম বিনিময় প্রথা চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে উন্নতদেশগুলো পূর্বের মতই অনুন্নত দেশগুলিতে তাদের পণ্য যথার্থ মূল্যের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করে এবং দরিদ্র দেশগুলির কাছ থেকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে স্বল্প বাজারদরে তাদের পণ্য ক্রয় করে। এভাবে দরিদ্র দেশগুলোর মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় ও তা বৃদ্ধি পায় ধনী দেশে। ইমানুয়েলের মতে এই দুই গোষ্ঠী দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ফলে দরিদ্র দেশগুলোকে যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশী দিতে হয়। ফলে এসব দেশের মূলধন সংগঠনের হার অনেক কম। এটা হল সংকীর্ণ অর্থে ইমানুয়েলের অসম বিনিময় তত্ত্ব। মানুষের উন্নত মানের ব্যয়ভার বহন করে এসব দেশের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র দেশগুলি। ইমানুয়েলের এই তত্ত্ব সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের তত্ত্বের সমার্থক। ধনী দেশগুলোর স্বার্থে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন নীতির আড়ালে যে ধরনের আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্য চালু আছে। তার ফলে এসবদেশে বিপুল মূলধন সঞ্চিত হয়েছে। যন্ত্রকৌশল উন্নততর হচ্ছে ও ক্রমশ শ্রম নিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে। তাই শুধু নিজেদের দেশে রপ্তানীর মধ্যে বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ধনতন্ত্রের মুনাফার পক্ষে অতীব ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে। ধনী দেশগুলি শিল্পোন্নয়নের নামে তাদের বাড়তি উৎপাদন দরিদ্র অনুন্নত দেশে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব মুনাফার হার বৃদ্ধি ও স্বদেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য তা সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র দরিদ্র দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও বেকার সমস্যা সৃষ্টির বিনিময়ে।[১৩]

আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক ঃ আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর Lumpenbourgeoisie, Lumpendevelopment (1970) প্রথম গ্রন্থ যেখানে তিনি নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন। নির্ভরশীলতার স্থায়িত্ব প্রদানে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা এখানে

[১৩] হোসেন, ফেরদৌস-নির্ভরশীলতা তত্ত্বঃ ধারনাগত বিভিন্নতা। রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, জুন-ডিসে : ১৯৯৩ পৃষ্ঠা - ২৭-২৮।

গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত Development Accumulation and Underdevelopment গ্রন্থটি নির্ভরশীলতা সম্পর্কীয় ধারণায় আর একটি সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হয়।[১৪] ফ্রাংক তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে (Capitalism and Underdevelopment in Latin America) বলেন যে, অনুন্নত দেশ সমূহের ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা বাণিজ্যশর্ত ও বিদেশী বিনিয়োগ অনুন্নত দেশ সমূহের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। কারণ অনুন্নত দেশগুলি প্রধানতঃ কাঁচামাল রপ্তানী করে এবং শিল্প পণ্য আমদানী করে। পক্ষান্তরে, উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশে রপ্তনী করে শিল্প পণ্য ও অনুন্নত দেশ থেকে আমদানী করে প্রাথমিক পণ্য, বিশেষ করে কাঁচামাল। পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বাজারে শিল্প পণ্যের মূল্য অধিক এবং কাঁচামালের মূল্য কম ধরা হয়। ফলে এই মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করা হয়। অপরদিকে উন্নত দেশের অনেক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বহুজাতিক কর্পোরেশন গুলো অনুন্নত দেশে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুনাফা হিসাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ অনুন্নত দেশ থেকে অপসারণ করে থাকে।[১৫]

ফ্রাংকের নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মূলভিত্তি হচ্ছে মেট্রোপলিস ও স্যাটেলাইটের আপেক্ষিকতা। এই মেট্রোপলিস স্যাটেলাইট শব্দ দুটিকে ফ্রাংক কেন্দ্র প্রান্ত ধারণার সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এই মেট্রোপলিস - স্যাটেলাইট সম্পর্ক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বিশ্বের প্রত্যন্ত পর্যন্ত শিকলের মত বিস্তৃত। ফ্রাংকের মতে, আন্তর্জাতিক মেট্রোপলিস গুলির তুলনায় জাতীয় মেট্রোপলিসগুলি স্যাটেলাইট। আবার আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির তুলনায় জাতীয় কেন্দ্রগুলি মেট্রোপলিস। এভাবে ছোট শহরের তুলনায় গ্রাম স্যাটেলাইট। এই সম্পর্ক শুধু ভৌগলিক নয় সামাজিক ও শ্রেণীগতও। সাধারণ কৃষকদের তুলনায় জমিদার বা ভূ-স্বামীর মেট্রোপলিস। মেট্রোপলিস ও স্যাটেলাইট সম্পর্কের সূত্রধরে উদ্বৃত্তের এক বড় অংশ চলে

[১৪] ইমাম, মোহাম্মদ হাসান (সম্পাদিত) - উন্নয়ন ও অনুন্নয় প্রসঙ্গ। কাফিবিল্লাহ, ৩৩৫ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৯৯।

[১৫] ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ - সামাজিক পবির্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নে রূপরেখা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯।

যায় ধনতান্ত্রিক বিশ্বের কেন্দ্রগুলিতে উদ্বৃত্তের অন্য একটা অংশ থেকে যায় এ সম্পর্কের বিভিন্ন সংযোগ গুলিতে। সংযোগ সাধনকারী কেন্দ্রগুলি উদ্বৃত্তের অংশীদারিত্ব বলে শোষণ ব্যবস্থাকে তারা ঠিক করে রাখতে চেষ্টা করে এবং ফলে সম্পর্কসূত্র গুলো ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হয়।[১৬]

ফ্রাংকের তত্ত্ব নিচে চিত্রায়িত হল ঃ-

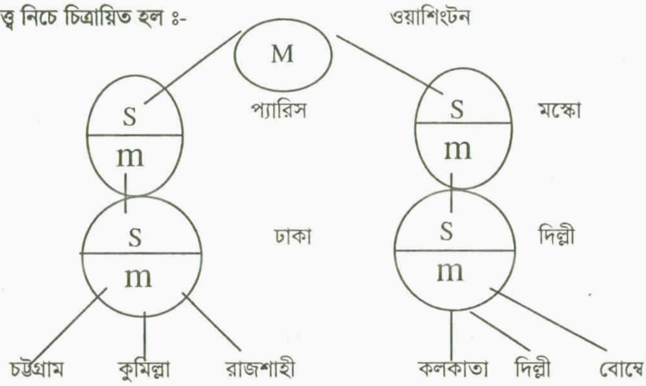

চিত্র নং - ৩ : ফ্রাংকের কেন্দ্র প্রান্ত মডেল

আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক বলয়ে, পেট্রোপলিস স্যাটেলাইট সম্পর্কের মাধ্যমে স্যাটেলাইট দেশগুলিতে কোন স্বাধীন উন্নয়ন সম্ভব নয়। ফ্রাংক তার নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মাধ্যমে এটাই দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলি আরও পুঁজিবাদী হচ্ছে আর অনুন্নত দেশগুলি আরও গরীব হচ্ছে। তিনি বলেন যে, অনুন্নত দেশগুলিতে যথেষ্ট সম্পদ, জনশক্তি ও শিক্ষার মান উন্নত থাকা সত্ত্বেও তারা অনুন্নত। ফ্রাংকের মতে, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন সম্পর্কিত যুগপৎ প্রক্রিয়া। এক অংশের উন্নয়ন ঘটে অপর অংশের অনুন্নয়নের মূল্যে। তাঁর মতে, এই মেট্রোপলিস স্যাটেলাইট ছিন্ন না করলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর পরবর্তী লেখায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, স্যাটেলাইট অবস্থায়ও কিছু কিছু উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের উন্নয়ন বিক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো যা সমাজের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিকশিত করে না। এ প্রক্রিয়াকে তিনি লুমপেন

[১৬] হোসেন, ফেরদৌস-নির্ভরশীলতা তত্ত্ব : ধারনাগত বিভিন্নতা রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, জুন-ডিসে: ১৯৯৩, পৃষ্ঠা : ২৬।

উন্নয়ন বলেছেন। আর লুমপেন উন্নয়নের সাথে সাথে বুর্জোয়ারা হচ্ছেন 'লুমপেন বুর্জোয়া'- যারা শ্রেণীগত স্বার্থে মেট্রোপলিটন কেন্দ্রগুলির আজ্ঞাবাহী। আর তাই এসব দেশে স্বাধীনভাবে উন্নয়ন সংঘটিত করা সম্ভব নয়।[১৭]

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ঃ- উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। এদেশে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোগত সকল বিষয়ে উন্নত বা কেন্দ্রীয় দেশের উপর নির্ভরশীল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ঃ বাংলাদেশে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ব্যাপ্তি ঘটে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে। বৃটিশরা এদেশ থেকে সম্পদ উদ্বৃত্ত অপসারিত করে বৃটেনে নিয়ে যাবার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে অনুন্নত এবং বৃটেন হয়েছে উন্নত। এছাড়া সস্তা শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্য আমাদের কাছেই পুনরায় বিক্রি করা হতো। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান পাশ্চাত্য পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বহুজাতিক কোম্পানী পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। আবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বৃত্ত পশ্চিম পাকিস্তানে অপসারিত হয় ফলে বাংলাদেশ ক্রমশ নির্ভরশীল হতে থাকে। স্বাধীনতার পর নির্ভরশীলতার পুরাতন কাঠামো ভেঙ্গে বাংলাদেশ সরাসরি আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বৈরশাসনের সময়ে এই নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। তখন বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি দেশে পরিণত হয়।

মানব সম্পদের উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ চালচিত্র

একটি মূল প্রশ্ন দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক- উন্নয়ন কি এবং কাদের জন্য ? উন্নয়নের মূল কথা হচ্ছে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। এক কথায় এই পুরো ব্যাপারটিকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে মানব উন্নয়ন বলে যা গত শতাব্দীর নব্বই

---

[১৭] ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ - সামাজিক পবির্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নে রূপরেখা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ৫০।

দশকে উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মানুষের উন্নয়নের কথা যখন বলি, তখন আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নকেই বুঝাই।[১৮]

বাংলাদেশের মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা সংগ্রামী এবং তাদের জাতীয়তাবোধ খুবই প্রখর। তাই এদেশের ভাবিষ্যত উজ্জ্বল। সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য যা প্রয়োজন তা হল - মানব সম্পদের উন্নয়ন। ভারতের রাজ্যসভার সরকার দলীয় সদস্য (বিজেপি) সাবেক আমলা টি এন চতুর্বেদী এবং নেপালী সংসদের সাবেক স্পিকার দামান নাথ দুঙ্গাঁনা প্রায় অভিন্ন ভাষায় বাংলাদেশ সম্পর্কে এমত ব্যক্ত করেছেন।[১৯]

১৯৯৫ সালে ১৭৪টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নের ক্রমবিন্যাসে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৪৬তম। যা আরও ক্রমাবনতি হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২৮৭ ডলার। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে ৩ কোটি লোকের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার ছিল না, আড়াই কোটি লোকের নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ছিল না এবং ১০ কোটি লোক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বঞ্চিত ছিল। ৪৭ লক্ষ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল না, ৫ বছরের নিচে ১.৩ কোটি শিশু অপুষ্টির শিকার হচ্ছিল। ৪ কোটি বয়স্ক মানুষ ছিল নিরক্ষর এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৭% লোকের অবস্থান ছিল দারিদ্র সীমার নিচে। মানব পুঁজি গঠনের কথা যদি বলি তাহলে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রতি ১ হাজার লোকের মধ্যে ০.৫ জন ছিল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ; উচ্চশিক্ষার স্ত রে নিবন্ধনের হার ছিল ০.৬%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের মাত্র ৪৬% প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। মাধ্যমিক স্তরে নিবন্ধনের হার মাত্র ১৯%। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ৬৩ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের মাত্র ০.৭% কারিগরি শিক্ষা লাভ করে। বাংলাদেশে প্রতি হাজার লোকের জন্য ৪২টি রেডিও, ৫টি টেলিভিশন ও ৫টি সংবাদপত্র রয়েছে। প্রতি ১ লক্ষ লোকের জন্য ১টি বই প্রকাশিত হয়। প্রতিটি ডাকঘর গড়ে ১৩ হাজার লোককে সেবা প্রদান

[১৮] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৬।

[১৯] দৈনিক জনকণ্ঠ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা-৩।

করতে পারে। এদেশে ৪৭% লোক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত। কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাত্র ১০% শিল্পখাতে নিয়োজিত।[২০]

বাংলাদেশে মানব উন্নয়নে ক্ষেত্রে তিনটি জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে অবহেলিত। এক হল নারী, শিশু ও গ্রামীন মানুষেরা। প্রতিহাজারে শিশু মৃত্যুর হার ছেলেদের ক্ষেত্রে যেখানে ৯৫ জন সেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ১০২ জন। বালকদের পুষ্টিহীনতা ৫% আর বালিকাদের মধ্যে ১৪%। মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের নিবন্ধন হার মাত্র ১১% আর উচ্চ শিক্ষায় ১%। ১৯৯০ সালে মেয়েদের মাত্র ২% প্রশাসনিক ও উর্ধ্বতন পদে কাজ করেছে। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া স্বত্ত্বেও জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিতান্তই কম। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এদেশে প্রতিহাজারে শিশু মৃত্যুর হার ১১১ জন, ৩৪% শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়। মাত্র ৩৬% শিশু প্রতিষেধক প্রাপ্ত। ৫ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ১৮৯ জন, চরম পুষ্টিহীনতার শিকার ৬৫% শিশু। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রাম ও নগরের মধ্যেও বৈষম্য বিদ্যমান। পুষ্টিহীনতা গ্রামে সেখানে ৫৮% শহরে তা ৪৪%। স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ সেখানে ৪০% নগর মানুষের প্রবেশাধিকার আছে। গ্রামে মাত্র ৪% মানুষের সে সুবিধা বিদ্যমান।[২১]

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে সরকারি নীতিমালা মানব উন্নয়ন মুখী নয়। আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৪% স্বাস্থ্যখাতে আর ২.০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধায় এদেশে মোট ব্যয় জাতীয় আয়ের ২.১% মাত্র। বৈদেশিক সাহায্য আমরা যা পেয়ে থাকি তার মাত্র ১৫ ভাগ সামাজিক খাতে ব্যয়িত হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সমন্বিত ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় সামরিক খাতে। আমাদের এসব সমস্যার কিছু কিছু প্রকৃতি সৃষ্ট আর কিছু কিছুর স্রষ্টা কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহ।[২২]

---

[২০] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৭-২৮।

[২১] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ৩০।

[২২] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ৩০

বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক ঋণ ঃ প্রতিবছর সেপ্টেম্বরে দাতা দেশগুলির প্যারিস কনসোর্টিয়াম বৈঠকে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। সে সাহায্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট ও সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বৈদেশিক সাহায্য দেবার সময় দাতা দেশ গ্রহীতা দেশের উপর রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করে এবং দেশের বৈদেশিক নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে যুক্তরাস্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বলেছিলেন "Foreign aid is a method by which the united states maintains a policy of influence and controls around the world and sustains a good number of countries which would definitely collages or go into communist block."[23]

বৈদেশিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্য

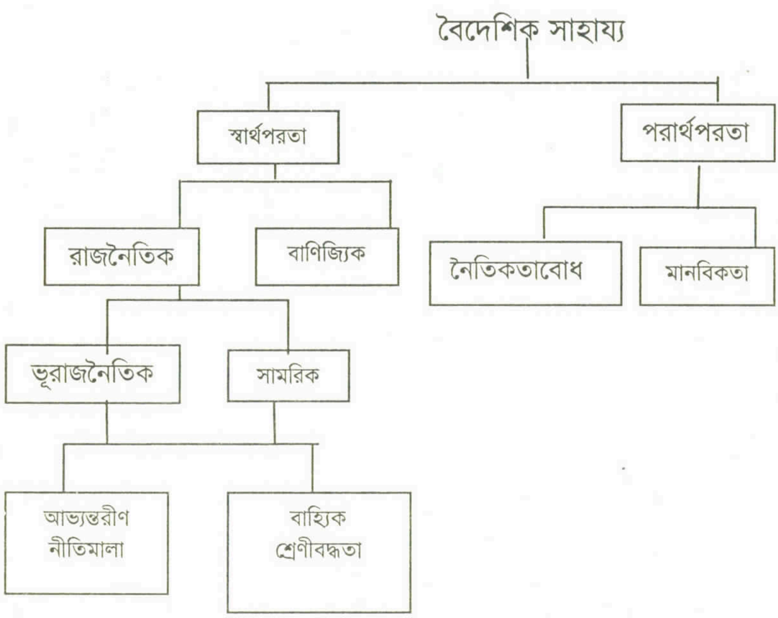

[২৩] হোসেন, মোঃ আব্দুল ও হোসেন, মোকাম্মেল গতিধারা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, জুলাই-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৯।

উৎসঃ উন্নয়ন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, মোঃ আবুল হোসেন, মোকাম্মেল হোসেন, জুলাই ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ৩৯।

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২৭ শত ৩০ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে শতকারা ৫১ ভাগ হল বৈদেশিক ঋণ সাহায্য। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ঋণের সুদসহ দায় পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১ কোটি ২৪ লক্ষ ডলার।[২৪] ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৫ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৯০৯ টাকা।[২৫] ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে ৫৯৮৩ মিলিয়ন ডলার। অন্যভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত ১ টাকা বৈদেশিক ঋণের জন্য ২০ পয়সা সুদ দিতে হয়েছে।[২৬] আমরা যাতে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে না পারি সেজন্য সাহায্যদাতা দেশসমূহ সার কীটনাশকের উপর ভর্তুকী তুলে নেবার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে দেখা যায় ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সারের মূল্য বাড়িয়ে দেয় যা ক্রমান্বয়ে সার থেকে ভর্তুকী তুলে নেয়ারই পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এক হিসাবে দেখা গেছে সরকার যদি সার থেকে ভর্তুকী তুলে নেয় তা হলে সরকারের সাশ্রয় হবে মাত্র ৬০ মিলিয়ন টাকা। অপরদিকে বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে প্রায় ৩০০ হাজার টন। আর এই পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য শস্য কিনতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার। প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৬৬ ভাগ সরাসরি খাদ্য সাহায্য এবং পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয় যা কঠোর শর্তযুক্ততার কারণে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন অবদান রাখতে পারছে না। অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ ঋণের মধ্যে প্রকল্প ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ চলে যায় সাহায্য দাতা দেশ সমূহের চাহিদা মেটাতে। এছাড়া যে কোন প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ, মূল্যায়ন ইত্যাদি বাবদ বিদেশী সাহায্য দাতারা মোট প্রকল্প খরেচের শতকরা ১৫ ভাগ প্রকল্প স্থাপনের

---

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪২।

[২৫] প্রথম আলো, ১৪ ই সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা-১।

[২৬] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা -৭৭।

পূর্বেই নিয়ে যায়।[২৭] বৈদেশিক সাহায্য শর্তযুক্ত হবার ফলে বিদেশী উৎপাদকরা যেমন লাভবান হচ্ছে তেমনি লাভবান হয়েছে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ। বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের সুবিধা দেশীয় কিছু কিছু গোষ্ঠীও পেয়েছে। যেমন- মোট সাহায্য প্রবাহের ১০.৩% দিয়ে দেশী পণ্য ক্রয় ও শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। আমলারা সেলামি বাবদ গ্রহণ করেছে ২.৬%, দালালরা পেয়েছে ৩%, দেশীয় ঠিকাদাররা ৫%, ও দেশীয় বিশেষজ্ঞ ১%। দেশীয় ঠিকাদারেদের মুনাফার হার পরিলক্ষিত হয়েছে ২০-৩০%; যার মানে ৫ মিলিয়ন ডলারের যন্ত্রপাতি আমদানী করলেও তাদের লাভ হয়েছে ন্যূনতম ১ মিলিয়ন ডলার। দেশীয় দালালরা যদি ৫% কমিশনও পায় তাহলে ৫ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প শুধু যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্য তারা পাচ্ছেন ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। প্রশ্ন হচ্ছে এতসব ভাগ বাটোয়ারার বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কি কিছু থাকে ?[২৮]

নির্ভরশীলতার ধারাবাহিক পটভূমিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন নিজস্বতা নেই, নেই কোন স্বকীয়তা বরং ক্রমশ সে হয়ে পড়ছে শৃঙ্খলাবদ্ধ। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরতার ফলে এদেশে আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য আমরা বিরাট একটা দায় সৃষ্টি করে যাচ্ছি।

বৈদেশিক বিনিয়োগ ঃ নিখুঁত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বিনিয়োগের অর্থ দাঁড়ায় দৃশ্যমান অর্থ সংগ্রহ করা। দৈনিন্দন কথা বার্তায় বিনিয়োগ শব্দটি সরাসরি অর্থে ব্যবহৃত হয়। উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে যে কোন প্রকার সম্পদ খাটানোকেই বিনিয়োগ বলা হয়। জুলাই ৯৬ থেকে মে ১৯৯৯ সময়ে বাংলাদেশ ২৮ হাজার ৮ শত ৮০ কোটি টাকার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে। এসময় ৪২৫টি প্রকল্প বিনিয়োগ বোর্ডের তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ বিনিয়োগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯৪ হাজার ৭৪ জনের কর্মসংস্থান করা যাবে।[২৯]

---

[২৭] দৈনিক সংবাদ ২ রা নভেম্বর ১৯৯৪ (সম্পাদকীয়)

[২৮] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা -৭৮।

[২৯] দৈনিক জনকণ্ঠ - ২রা নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৬।

বিনিয়োগ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের খসড়া প্রতিবেদন

বিদেশী বিনিয়োগ এর ১৪টি সমস্যাঃ-

১। বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি

২। অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব

৩। বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি জায়গাতেই সেবা প্রদানের ব্যবস্থা অর্থাৎ ওয়ান-ষ্টপ সার্ভিসের অভাব

৪। ঘোষিত সরকার নীতি বাস্তবায়নের ও সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ের অভাব

৫। শ্রমিক বিশৃংখলা ও শ্রমিক ইউনিয়নের জঙ্গীপনা

৬। হরতালসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

৭। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ইনসেনটিভ বা উৎসাহ দানের অভাব ও অবকাঠামোগতভাবে পিছিয়ে থাকা।

৮। কাস্টম ছাড় করানো নির্দেশ

৯। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব

১০। নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরাসরি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তের অভাব

১১। আমদানী ও বাণিজ্যনীতি দ্রুত উদার করার ফলে স্থানীয় পণ্য উৎপাদন শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব

১২। দক্ষ ও কার্যকর বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর অভাব

১৩। ঋণের সুদের উচ্চহার

১৪। দুর্নীতি।

১৯৯৮ সালের শেষের দিকে ঢাকা শেয়ার বাজারের মূল্য সূচক ৭৫০ থেকে ৩৫০০ তে লাফিয়ে উঠে। তখন সরকারও এর কৃতিত্বটুকু নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে অচিরেই ধ্বস নামে শেয়ার বাজারে এবং হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারী বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে শেয়ার বাজারের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী

কারণগুলো খুজে বের করার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপে এ অবস্থার সৃষ্টির জন্য ১৫টি কোম্পনী এবং ব্রোকার ডিলার ৩২ জন মালিক ও কর্মকর্তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে। শেয়ারবাজার থেকে ৫০০ কোটি টাকা চলে গেছে দেশের বাইরে যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বিনিয়োগের অন্য ক্ষেত্রে। আমরা বিদেশী বিনিয়োগ পেতে আগ্রহী তবে অতি আগ্রহী হলে এর মূল্যও বেশী দিতে হবে। যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনে বিদেশীরা গ্যাসখাতে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে তা আমাদের স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।[৩০]

আরেকটি দিকে বিশেষ নজর দেয়া দরকার সেটা হল চুক্তি সইয়ের পূর্বে আরো ভাল করে দেখা হোক বাংলাদেশ বিদেশী কোম্পনীগুলোর সংগে কি শর্তে চুক্তি করছে। এমনও হতে পারে এসব চুক্তি দ্বারা ভোক্তা শোষণের পথ খুলে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ বিদেশী কোম্পানী গুলোর সাথে যেসব চুক্তি সই করেছে সেগুলো সীমিত আকারে হলেও প্রকাশ করা উচিত। যাতে করে জনগণ তাদের পরামর্শ দিতে পারে। চুক্তিতে একবার ক্রুটি থেকে গেলে বিদেশী কোম্পানীগুলো সে ক্রুটিগুলোকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করবে।[৩১]

বহুজাতিক কোম্পানী আধিপত্য ঃ যদি একদেশের সম্পদ আর মালিকানা সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে প্রবেশ করে এবং তা যদি হয় মাল্টিন্যাশনাল তবে বলতে হবে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই বহুজাতিক কোম্পানীর উৎপত্তি হয়েছে।

এক হিসাব অনুযায়ী জানা যায় প্রায় ৪০০ মত বহুজাতিক কোম্পনী বিশ্বের মূলধনী সরঞ্জামের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ২০০০ সালে এ নিয়ন্ত্রণ শতকরা ৯০ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে। ১৯৯১ সাল নাগাদ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মত এবং এদরে কর্মচারীর সংখ্যা

---

[৩০] হোসেন, মোঃ আব্দুল ও হোসেন, মোকাম্মেল গতিধারা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, জুলাই-১৯৯৯, পৃষ্ঠা -৮১।

[৩১] প্রথম আলো বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গতিধারা ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৮১।

পৃথিবীর অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও দ্বিগুণ।[৩২] মুনাফা হস্তান্তর ও লভ্যাংশ বিষয়ে বাংলাদেশের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সবসময়ই গোপনীয়তা রক্ষা করে। বাংলাদেশের দুজন অর্থনীতিবিদ বহুজাতিক কোম্পনী গুলোর সার্বিক চিত্র নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত Development Policy Review জার্নালে ১৯৮৬ সালে। তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮২-৮৩ সময়ে বহুজাতিক কোম্পনীগুলো ৭৭৫.৯৮ মিলিয়ন টাকা মুনাফা এবং লভ্যাংশ বাবদ নিজ নিজ দেশে প্রেরণ করে।[৩৩] বহুজাতিক কোম্পানীগুলো মুনাফাকে প্রাধান্য দেয়, জীবনকে নয়। বাংলাদেশের ঔষধের ব্যবসায়ী বহুজাতিক সংস্থাগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসা করছে, লুটছে মুনাফা, অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এবং As between 1977 and 1983 at a time, when the government of Bangladesh was laying down the red carpet for foreign investors, Bangladesh one of the poorest countries in the world, was exporting capital abroad to the extent of Tk.618.3 million. It follows that unless there is a quantum escalation in new inflows of provision capital the further liberalization of provision for remittances of profits by multinational corporations will in the years ahead increse the net drainage of resources out of Bangladesh.[34]

---

[৩২] ভট্টচার্য, হরিপদ ও রহমান, মোঃ মিজানুর - আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বানিজ্যিক প্রকৃতি ও পরিধি-একটি সমীক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল,
৩য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৮৫।

[৩৩] Task Force Report Vol-2, 1991.

[৩৪] ভট্টচার্য, হরিপদ ও রহমান, মোঃ মিজানুর - আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বানিজ্যিক প্রকৃতি ও পরিধি-একটি সমীক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৮৫।

রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা ঃ

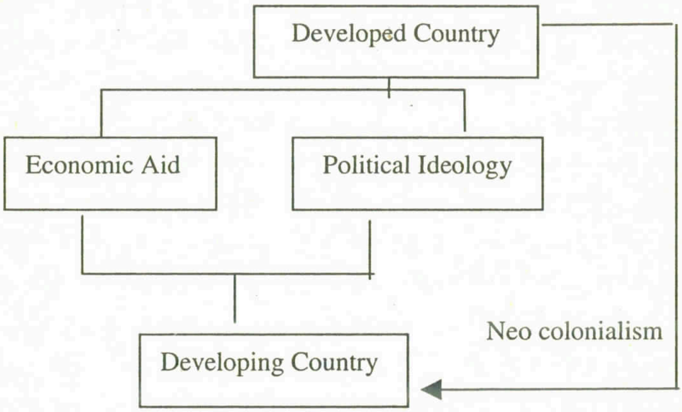

Fig - 4: Vicious circle of Neo colonialism

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত দেশগুলোর আর্থিক অনুদান, রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অতি সুকৌশলে শাসন করছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করছে নয়া সাম্রাজ্যবাদ যার মাধ্যমে নির্ভরশীলতা বাড়ছে।

আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন ঃ আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে আমাদের সংস্কৃতিতে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে আমাদের মূল্যবোধ। আমরা দেশীয় মূল্যবোধ ছেড়ে ঝুঁকে পরছি অন্য দেশের সংস্কৃতির প্রতি যা আমাদের জন্য কখনই কাম্য হতে পারে না। আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা দেখা দিচ্ছে। বাইরের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে আমাদের পণ্য টিকে থাকতে পারছে না। ফলে আকাশ সংস্কৃতির কারণে আমরা নির্ভরশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ছি যা সত্যিই বেদনাদায়ক।

উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ঃ নিজ দেশের মানুষের মতামতের চেয়ে বাইরের নীতি নির্ভর উন্নয়ন মডেলের কারণেই উন্নয়ন সংকট চলছে এদেশে। আইডিবি ভবনে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়ারপোব মহাপরিচালক হালিমার রহমান নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জনগণের

অংশগ্রহণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার উপর জোর দেন। মানুষের চাহিদা ও মতামতের তোয়াক্কা না করে পানি ব্যবস্থাপনায় এত টাকা ঢালার পরও পানি উন্নয়ন বোর্ড বড় রকমের কোন সাফল্য দাবী করতে পারছে না। শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের কথামত কোন প্রকল্প গ্রহণ না করে সাধারণ মানুষের মতামত যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে দুই মিলে একটি ভাল সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সাধারণ মানুষের এই সহজাত জ্ঞানকে আমরা সবসময়ই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে সচিবালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে দালাল, সরকারি কর্মকর্তাদের ও বিশেষজ্ঞদের উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে দেশকে পরনির্ভরশীলতার দিকে ঠেলে দিয়েছি এবং এখনও দিচ্ছি।[৩৫]

উপসংহার ঃ

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে। এর মাধ্যমে বের হয়ে আসে বাংলাদেশের দৈন্যদশা। বাংলাদেশ নির্ভর করে আছে বিদেশী সাহায্যকারী দেশ ও দাতা সংস্থার উপর আর বাংলাদেশের বাকী ৬৩টি জেলার নির্ভর করে আছে রাজধানী ঢাকার উপর। অবস্থাটা এমন, ঢাকার মুখে রোজ পাউডার - রক্তশূন্য বাংলাদেশ। উন্নত বিশ্ব নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে আমাদের রক্ত শোষণ করে। এই বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে আত্মনির্ভরতার নতুন দিগন্ত। নতুবা এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরতার ফলে এদেশের আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য আমরা একটা বিরাট দায় সৃষ্টি করে যাচ্ছি। এ অবস্থা বদলাতে হলে পরনির্ভরতার বিকল্প উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। কিন্তু তার জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র যন্ত্র ও কাঠামোর পরিবর্তন।

তথ্য নির্দেশিকা

ইমাম, মোহাম্মদ হাসান, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, *উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ* (সম্পাদিত), কাফি বিল্লাহ ৩৩৫ পঃ রামপুরা, ঢাকা-১২১৭। পৃষ্ঠা - ২৮৮।

হোসেন, ফেরদৌস, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, *নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ঃ ধারণাগত বিভিন্নতা।* রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল।

[৩৫] দৈনিক জনকণ্ঠ ২১শে নভেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৩।

ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, *সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা।* আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

জাহান, সেলিম, , ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, *অর্থনীতির কড়চা;* সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

হোসেন, মোঃ আব্দুল ও হোসেন, মোকাম্মেল, জুলাই ১৯৯৯, *উন্নয়ন প্রসঙ্গ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* গতিধারা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ভট্টাচার্য, হরিপদ ও রহমান, মোঃ মিজানুর, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, *আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক প্রকৃতি ও পরিধি* - একটি সমীক্ষা - রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, ৩য় সংখ্যা।

Task Force Report, Vol. - 2, 1991.

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

প্রথম আলো, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০০।

দৈনিক সংবাদ, ২রা নভেম্বর, ১৯৯৪ (সম্পাদকীয়)।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২রা নভেম্বর, ১৯৯৯।

প্রথম আলো, ৩০শে আগষ্ট, ২০০০।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৮।

Dos, Santos - ***Dependency Relations and political Development in Latin America:*** Some Considerations in Ibero America, Vol. - II, No. - 1.

Magnus Blomstrom and Bjorn Hettne 1980, ***Development theory in Trenition London.***

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

সিভিল সার্ভিস, প্রশাসনের কাছে জনগণের প্রত্যাশা

গাজী মিজানুর রহমান*

Civil Service, Expectation of people to Administration

Gazi Mizanur Rahman

Abstract : The present write-up speculates on the function and criticism of the Administration Cadre officers so far as their approach to people and politics is concerned. Democratic thoughts and activities respect for the political leaders as local elite, commitment to enforce law equally upon all citizens are specially emphasized.

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য স্বল্পকালের। অতীতে আদর্শের রাজনীতি-চর্চা এখানে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। রাজনৈতিক অংগনে মাঝে মাঝে শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে এবং সেই শূন্যতা পূরণে সকল রাজনৈতিক মহলের সার্বিক অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার সুযোগে চিহ্নিত কিছু উপসর্গ রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে। ফলে রাজনীতির প্রতি মানুষের সর্বময় আস্থার ভিত গড়ে উঠতে সময় লাগছে এবং এই সর্বময় আস্থার অভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসন চালানোর কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে 'আমলা' বলে দূরে ঠেলে দিয়ে জনগণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না। দুঃসময়ের সাথী হিসেবে তাদেরকে মনে মনে হাতের পাঁচ হিসেবে ধরে রাখতে হচ্ছে। তাই উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে আমাদের দেশ প্রশাসন চালানোর কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাছে জনগণের চাহিদা বেশী।

প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছেন, জনগণের সাথে মিশতে হবে এবং তাদের হৃদস্পন্দন বুঝে কাজ

* উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা।

করতে হবে। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি এসেছে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক যে সমস্ত সি,এস,পি, বা ই,পি,সি,এস, অফিসার এদশে ছিলেন তাদের কেউ কেউ সরাসরি যুদ্ধে যোগ দিয়ে, কেউ কেউ পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে মানুষের মন জয় করতে সুযোগ পেয়েছিলেন। চাকরির লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রথম পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছিলেন ইতিহাস তাদের চিরকাল মনে রাখবে। আর যারা চাকরিতে থেকেও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন তাদের অবদানও কম ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিভিল সার্ভিস প্রশাসনের ঐসব কর্মকর্তা এবং তাদের উত্তরসূরীরা মানুষের কাছাকাছি আসার এবং বৃহত্তর জনগণের সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়ার ঐতিহ্যকে ধরে রেখে সামনে এগিয়েছেন।

ঔপনিবেশিক আমলে বা পাকিস্তানী আমলে কাজ করা প্রশাসনের অফিসারদের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশে দায়িত্ব-পালনকারী অফিসারদের মননে তাই অনেক ব্যবধান। এই প্রজন্মের অফিসারগণ আগের চেয়ে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ, অনেক বেশী জনগণমুখী, অনেক বেশী আত্মপ্রচারবিমুখ, অনেক বেশী সাধারণ জীবন-যাপনকারী, অনেক বেশী মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতাসম্পন্ন। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের অথবা সামরিক শাসনের অধীন আমলাতন্ত্রের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল জনবিচ্ছিন্ন থেকে ক্ষমতাসীনকে মদদ দেয়া। এই নীতি বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। তদস্থলে স্বাধীন দেশের মানুষের ভালমন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এর অফিসারদের দায়বদ্ধতা এখন দুই রকমের। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় ক্ষমতাসীন দলকে সহায়তা দান তার দায়বদ্ধতার প্রথম অংশ। এ দায়বদ্ধতা তার মগজ থেকে হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু অন্য যে দায়বদ্ধতা তা হৃদয়ে, জনকল্যাণ শব্দ দিয়ে যা বোঝানো হয়, সেই মহাবিবেকের কাছে।

আমাদের দেশে দীর্ঘকালীন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার অভাবে দেশের

প্রতিটি স্তরে রাজনীতি-বৃক্ষ আস্থার শিকড় গাড়তে পারেনি বলে নিচের স্তরগুলোতে এখানো রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি প্রশাসনের অফিসারদেরকে জনগণ দেখতে চায়। রাজনৈতিক নেতার কর্মকাণ্ড যাতে পর্যালোচিত ও পরীক্ষিত হওয়ার মত একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে, তার জন্যই এই চাওয়া। জনগণের এই প্রত্যাশাগুলোকে প্রশাসনের যে সব কর্মকর্তা নিজ দায়িত্ব পালনের সময় মনে রাখেন, তারাই পারেন তথাকথিত আমলা, যে অর্থে 'আমলা' শব্দটিকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে। তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এমন এক অবস্থানে, যেখান থেকে তাদের জোর করে সরালে জনগণের মন নড়ে ওঠে ও পরবর্তী ভোটের সময় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অপরদিকে ক্ষুদ্র স্বার্থকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে যারা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে চান তাদেরকে জনগণের চোখে হেয় হতে হয়। ঐ সব কর্মকর্তা পুরোনো কর্মস্থলে ফিরে এলে বুক টান করে চলতে পারেন না, পুরোনো কর্মস্থলে ভিজিটকে তারা এড়িয়ে চলেন। মনে রাখা উচিত যে, উপজেলা প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন বা কোন সংস্থার প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভালো কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে তা একসময় মূল্যায়ন হবেই। প্রতিকূল অবস্থার কারণে কাজ করতে ব্যর্থ হলে সেটুকু জনগণ বোঝে এবং মূল্যায়ন করে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বিভিন্ন সংঘ, সমিতি, সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটে থাকে। এইগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ না দিয়ে প্রশাসন চালানোর কাজে তাদের সহযোগিতা পাওয়ার মত বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াই কাম্য। প্রশাসনের অফিসারদের ধারণায় ওইসব মানুষকে সুশীল ভদ্রলোকের মর্যাদা দান এবং তাদের ধারণায় অফিসারটি তাদের শত্রু নয়, তাদেরকে মূল্য দেয়, এরূপ পারস্পরিক শ্রদ্ধার অবস্থান সৃষ্টি হওয়া একান্তভাবে কাম্য। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ যে যেখানে আছেন, কাজের সময় সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার সুযোগ তাদের রয়েছে। কোন বিষয়ে কেউ

আলোচনা করতে চাইলে এবং মতামত দিতে চাইলে তা ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করে তাকে যুক্তি দিয়ে স্বমতে আনা অথবা তার যুক্তি ভালো হলে তা গ্রহণ করার মানসিকতা সকলের থাকতে হবে। একমাত্র বিচার বিভাগীয় কাজে কারো সাথে আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিচার সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আজকাল মানুষ কথা বলতে চায় বেশী। জামিনের তদ্‌বিরের মাধ্যমে যেভাবে সারা দেশের সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এর কর্মকর্তাদের বিব্রত করা হয়, তাতে জেলা প্রশাসক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্মস্থলে যোগ দেয়ার আগে এই বিষয়টি নিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী ভাবিত হন।

প্রশাসন ক্যাডারের চাকরিতে যারা যোগ দেন ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার প্রতি তাদের একটা আকর্ষণ থাকে। এই আকর্ষণের জন্য অন্য ক্যাডারের চেয়ে প্রশাসন ক্যাডারকে তারা আগে বেছে নেন। অন্যান্য ক্যাডারের বড় বড় পোষ্টের লোকদের সাধারণ মানুষ না চিনলেও ম্যাজিস্ট্রেটদের চেনে। সার্বিকভাবে যে কাজগুলি জনগুরুত্বপূর্ণ সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থেকে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারগণ সেই কাজগুলি সম্পন্ন করেন। পরীক্ষা পরিচালনা করা, নির্বাচন পরিচালনা করা, বড় বড় সভা-সমাবেশে আইন-শৃঙ্খলার কাজ তদারক করা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, মহামারী, নদী ভাঙ্গনের সময় দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা, এইসব কাজের মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারবৃন্দকে জনগণের কাজে আসতে হয়। জনগণ বিশ্বাস করে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারবৃন্দকে জনগণের কাছে আসতে হয়। জনগণ বিশ্বাস করে প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারগণ শুধুই অফিসার নন, তারা ম্যাজিস্ট্রেটও। ম্যাজিস্ট্রেট যে কাজই করুক না কেন, তার পশ্চাতে একটি আইনী বা পদ্ধতিগত শৃংখলাবোধ ও ন্যায়বোধের তাড়না থাকে। এই কারণেই অন্যান্য ক্যাডারের অফিসারগণের সম্পাদিত কাজেও অনেক সময় জনগণের কাছে স্বচ্ছতার আশায় প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারদের সম্পৃক্ত রাখা হয়। পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র হেফাজত করা, টেন্ডার বিষয়ক লটারীতে উপস্থিত থাকা, বিতর্কিত মালামালের তালিকা প্রস্তুত করা, খাদ্য গুদাম যাচাই করা, এই রূপ অনেক কাজে ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিজস্ব বিভাগীয় সম্পৃক্ততা না থাকলেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। জনগণের কাছে অধিকতর স্বচ্ছতার আশায় ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বা প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে

এসব কাজে জড়িত করা হয়। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রতি জনগণের এই আস্থা সমুন্নত রাখা এই ক্যাডারের অফিসারদের পবিত্র দায়িত্ব।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী প্রশাসন চলে। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে সংসদে পাশকৃত আইন, মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনযন্ত্র চালাবার কাজে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সরকারের নীতি বাস্তবায়নমূলক যে কোন কাজে স্থানীয় নেতৃত্বের পরামর্শ থাকলে তা অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে দেখা কর্তব্য। কিন্তু বিদ্যমান আইন এবং নীতিমালার পরিপন্থী কোন পরামর্শ যথাসম্ভব কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া প্রশাসনের কর্মকর্তার কাজ। শ্রদ্ধা-প্রকাশ যেন তোষণমূলক ভাঁড়ামির পর্যায়ে উপনীত না হয়-তা খেয়াল রাখা উচিত। ক্ষমতাসীনকে তোষণ এবং চাটুকারিতার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পদধারী প্রশাসনিক কর্মকর্তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেলে সার্বিক প্রশাসনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সংকটের সময়ে বিরোধী অবস্থানের মানুষগুলো চরম অবস্থানে চলে যায়। পকেটস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার কথায় তখন কেউ কর্ণপাত করে না। অতএব, প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার এমন একটি ভাবমূর্তি গড়ে উঠা উচিত যাতে ক্ষমতাসীন দল যদি কোন ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের সাথে নেগোসিয়েট করতে চায়, সেই নেগোসিয়েটিং আইস-ব্রেকার যেন প্রশাসনের কর্মকর্তাটি হতে পারেন তার এরূপ গ্রহণযোগ্যতা থাকা উচিত।

ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো যেমন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব তেমনি বিরোধী পক্ষকে অগণতান্ত্রিক আগ্রাসন থেকে যথাসম্ভব সুরক্ষা দেয়া প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাজ। সংবিধান এবং আইনের শাসন এই সুরক্ষার স্বীকৃতি দেয়। সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা কম চিন্তা করেন, তারাই এইরূপ অবস্থান নিতে পারেন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা কোন ইজম্ বা শ্লোগানের বশংবদ নয়, যারা কেবলই ভোটার এবং যারা জানে সরকারী দল ও বিরোধী দল জাতির দুটি হাত, তারা ওইসব কর্মকর্তাকে ভালোবাসেন। অনুদিকে, ক্ষমতায় থাকার সময় ক্ষমতার দাপটে যারা কাজ করিয়ে নিতে না পেরে গালাগাল করেন বা

নিবর্তনমূলক পোস্টিং এর ব্যবস্থা করেন, তারাও কর্মকর্তাটি যে ভালো অফিসার ছিলেন, তা স্বীকার করেন; তবে তা সময়ের ব্যবধানে, যখন ক্ষমতার বলয় থেকে বাইরে চলে গিয়ে বিরোধী শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়, তখন। সে সময় তারা বুঝতে পারেন যে, ক্ষমতাসীন দলের লোকের কথায় কাজ করতে গিয়ে যারা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে কিছু কিছু কাজ করতে পারেন না, তারাই আসলে ভালো অফিসার।

প্রশাসন শব্দটি আজকাল এত বেশী ব্যবহৃত হয় যে, কোন্‌টি আসল প্রশাসন তা বুঝে ওঠা মুস্কিল। আসল প্রশাসনের সাথে আবার 'প্রশাসন' কথাটা না রাখার জন্য অনেকেই মত দিয়ে থাকেন। যাই হোক না কেন, 'প্রশাসন' শব্দটির সাথে রাজা-মহারাজা, জমিদার বা স্বৈরাচারী শাসনের কোন মিল নেই। প্রশাসন বলতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন পদ্ধতিকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার (নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত) অধীন। প্রশাসনের অফিসারদের তাই আত্মশ্লাঘা হওয়ার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি 'প্রশাসন' শব্দটির প্রতি অন্যদের স্পর্শকাতর হওয়ারও কোনো কারণ নেই। সংবিধান, আইন, বৈধ কর্তৃপক্ষের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের অধীনে 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছে' এটা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক দল এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করাও প্রশাসনের আর একটি মৌলিক কাজ। এর মধ্যে খবরদারিমূলক আচরণ করার সুযোগ প্রশাসনের অফিসারদের নেই।

তথ্য নির্দেশিকা

The Consititution of the People's Republic of Bangladesh.

Muzaffar Ahmed, Choudhury (1969), ***The Civil Service in Pakistan.*** NIPA, Dhaka.

Naquib Muslim, Syed (1997), ***The Art of Modern Administration,*** BIAM, Dhaka.

Muhit, A. M. A. (1968), ***The Deputy Commissioners in East Pakistan,*** NIPA, Dhaka.

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী

বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

জাতীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সমীক্ষা

কে. এম. মহিউদ্দিন *

মোজাম্মেল হক **

National Politics and Local Government : A Review of Union Parishad

K. M. Mohiuddin

Mozammel Huq

Abstract : Strengthening local government is a popular issue and precondition for ensuring good govenance. After the independence of Bangladesh, all governments constituted various commission or committee to reform of local government structure. The objectives of these reform were to introduce participatory local government. However, most of such aims could not be achieved. The significant exception has been women representation issue. The reality in local government structure in Bangladesh is that every successive government has imposed central control over local government. Besides, the field administration has been given the responsibility of looking after the local government affairs. Though the Union Parishad (UP) is the only representative tier of local self-government, it has not been developed into an autonomous body. Not only the central government but also the local political elite including MPs have tried to impose their control over UP. In this backdrop UP are facing critical problems to initiate and implement development programs and also to excise their own power which they deserve by dint of legislation. Since the late eighties NGOs have played a vital role for democracy building at grassroot levels. The implement capacity building programs UP and concentization of the

* প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

** কর্মকর্তা, কেয়ার বাংলাদেশ।

rural people to make their effecitve participation in the UP. This article intends to analyze the central government's role in local government sector particularly emphasis on central government and UP relationship, performance of the local political elite as well as the relationship between UP and NGO's.

ভূমিকা

তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এক অপরিহার্য উপাদান। পৃথিবীতে এমন খুব কম দেশই রয়েছে যেখানে গণতন্ত্র সুসংহত অথচ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার উপলব্ধি থেকে সংবিধানে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯-এ বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।" এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১-এ বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে[১]।" কিন্তু বাস্তবতা হলো জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তৃণমূল পর্যায়ে নিজেদের ক্ষমতার ভিত নির্মাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়। যার ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় তিন দশক অতিবাহিত হলেও আজ অবধি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সত্যিকার অর্থে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা জনগণের কাছের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেনি। এর প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ সহ স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের বিষয়টি দাতা সংস্থা, এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে, সেই সাথে সরকারও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে।

তৃণমূল পর্যায়ে একমাত্র নির্বাচিত জন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড কিভাবে জাতীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক, স্থানীয় সাংসদ কিভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে থাকে এবং সাম্প্রতিককালে তৃণমূলপর্যায়ে কর্মরত এনজিও সমূহের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযুক্ততা এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাথমিক তথ্য ও সহায়ক তথ্যের ব্যবহার করা হয়েছে। সহায়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন হতে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের তিনটি জেলার মোট ৬টি ইউনিয়ন পরিষদকে (পাবনার সাঁথিয়া থানার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, নেত্রকোনা জেলার সদর থানার মেদনি ও কাইলাটি ইউনিয়ন পরিষদ এবং সন্দ্বীপ থানার মগধারা, মাইটবাঙ্গা ও সারিকাইত ইউনিয়ন পরিষদ) উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ণ পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়েছে। গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থান করে সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কেইসস্টাডি পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাধীন এলাকায় ব্র্যাক, প্রশিকা, নিজেরা করি ও বাংলাদেশে নারী প্রগতি সংঘ জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য এনজিও'র কার্যক্রম রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় রাজনীতি

আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের গোড়াপত্তন ঘটে ঔপনিবেশিক সময়ে প্রণীত 'গ্রাম চৌকিদারী আইন-১৮৭০' এর মাধ্যমে। তারপর সময়ে সময়ে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের বিকাশ ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার স্থানীয় উন্নয়নের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহৃত হয়েছে। জনগণের কল্যাণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি এবং সে বিষয়ে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাও প্রণীত হয়নি[২]। ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকারের সংস্কার সাধনের নামে রাজনৈতিক ও সামরিক সরকারসমূহ তাদের ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ইউনিয়ন

কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল তাতে 'জনগণের অংশগ্রহণে জনগণের শাসন' কার্যত অনুপস্থিত ছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বকারী মৌলিক গণতন্ত্রীরা যতটা না জনপ্রতিনিধি ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন সামরিক শাসকের প্রতিনিধি। স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের পরিবর্তে জাতীয় রাজনীতিতে তারা অধিকতর আগ্রহী ও সম্পৃক্ত ছিল। একই ধারায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সামরিক সরকারসমূহ তাদের বৈধতার সংকট থেকে উত্তরণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি তৈরির জন্য স্থানীয় সরকারকে ব্যবহার করেছেন। অতীতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে না তোলার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হলো, এদের উপর আস্থার অভাব। এর জন্য এদেরকে মনোনীত সদস্য/সদস্যা অথবা নিয়োগকৃত চেয়ারম্যানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে[৩]। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদেরই রয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো। রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোটিকে ব্যবহারের ফলে ইউনিয়ন পরিষদ একটি স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে সরকার রদবদলের সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো ও কার্যাবলীতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কাঠামোগতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হলেও কার্যত এর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়নি, প্রথমতঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনার পর উক্ত প্রস্তাব পাসের জন্য বিশেষ সভা আহ্বান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার যিনি ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তার মাধ্যমেই উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি ও প্রকল্প অনুমোদন, বাজেট অনুমোদন ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হন[৪]।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত যে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল সামরিক শাসনামলে অর্থাৎ ১৯৭৫ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই সাংবিধানিক নিশ্চয়তাকে স্থগিত করে বিশেষ অধ্যাদেশ ও আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য কাঠামোর মতো ইউনিয়ন পরিষদকেও পরিচালনা করা হয়েছে[৫]। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সরকার গঠনের পরপরই শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের রিপোর্টে জন অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই সাথে লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৯৬ সালে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর কর্মক্ষম করার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, যার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, নির্বাচিত নারী সদস্যদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ফলে নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটেনি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বা সংস্কারের জন্য গঠিত কমিটি বা কমিশন সমূহের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, সেগুলো সীমাবদ্ধ থেকে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের প্রতিশ্রুতির মধ্যে, কিন্তু ক্ষমতায়নের কোন উল্লেখ নেই। ফলে এ সকল কমিটি বা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিবর্তিত স্থানীয় সরকার দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সময়ে সরকার তৃণমূল পর্যায়ে তার ক্ষমতার ভিত শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে নানাভাবে পরিবর্তন করেছে। শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল কাঠামোয় স্থানীয় সরকারকে দলীয় সমর্থনের ভিত হিসেবে বিবেচনা করেছেন, জিয়াউর রহমান তাঁর রাজনীতির ভিত তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করার মানসে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন বলে মনে করা হয় এবং তারপর হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য গ্রাম

সরকার ব্যবস্থা বাতিল ও উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এরশাদের রাজনৈতিক হীন স্বার্থের জন্য উপজেলা পরিষদকে ব্যবহার করায় এটি কার্যকর ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। পরবর্তী সরকার একইভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই উপজেলা পরিষদকে বাতিল করেছিলেন বলে মনে করা হয়[৬]। স্থানীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মুক্ত না থাকায় জাতীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যার ফলে দেখা যায় যে স্থানীয় নির্বাচন অরাজনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থিত প্রার্থিরা এ নির্বাচনে অংশ নেয়[৭]।

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী কিংবা সমর্থক। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক যোগাযোগকে সম্পদ ও সুবিধা বন্টনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং এর ফলে জাতীয় রাজনীতি ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। গবেষণাধীন ৫টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্যে সকলেই বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের থানা পর্যায়ের নেতা। সদস্যদের মধ্যে ৩২ জন আওয়ামীলীগ, ১০ জন বিএনপি এবং ২ জন জাতীয় পার্টির সাথে যুক্ত। অবশিষ্ট ৯ জন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নন এবং তাদের মধ্যে ১ জন পুরুষ সদস্য ও অন্যান্যরা পরিষদের নারী সদস্য।

টেবিল- ১ ঃ প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার ধরন

প্রতিনিধির ধরন	আ. লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	অন্যান্য	কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন	মোট
চেয়ারম্যান	৩ (৪.৬১%)	১ (১.৫৪%)	১ (১.৫৪%)	-	-	৫ (৭.৬৯%)
পুরুষ সদস্য	৩২ (৪৯.২৩%)	১০ (১৫.৩৮%)	২ (৩.০৮%)	-	১ (১.৫৪%)	৪৫ (৬৯.২৩%)
নারী সদস্য	৫ (৭.৬৯%)	২ (৩.০৮%)	-	-	৮ (১২.৩০%)	১৫ (২৩.০৭%)
মোট	৪০ (৬১.৫৩%)	১৩ (২০%)	৩ (৪.৬২%)	-	৯ (১৩.৮৫%)	৬৫ (১০০%)

গবেষণা এলাকার কাইলাটি, মেদনি, মগধারা, মাইটভাঙ্গা ও ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কাইলাটি ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমান চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময়ে বিএনপি'র সমর্থনে নির্বাচন করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আওয়ামীলীগের সমর্থন নিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচনী সময়ের শুরুতেই দু'টি রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়েছিল এবং নির্বাচনী প্রচারে উভয় দলের জেলা পর্যায়ের নেতারা স্ব স্ব প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কার্য চালান। নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে আসেন। বর্তমান চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনায় জানা যায় তাঁর কাজের সুবিধা ও অবস্থানকে সুসংহত রাখার জন্য স্থানীয় সাংসদের সাথে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীকে বিভিন্ন কমিটিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। গবেষণা এলাকার মেদনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন বিএনপি সমর্থক, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন দলের আনুকূল্য লাভের জন্য আওয়ামীলীগে যোগ দেন। উভয় ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও নারী সদস্যদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, স্থানীয় সাংসদের সাথে সরাসরি তাদের কোন যোগাযোগ হয় না এবং সাংসদ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করেন না। বিশেষ কোন প্রয়োজনে সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে হলে তাঁর অনুসারী রাজনৈতিক কর্মীদের সহায়তা নিতে হয়। গবেষণা এলাকা সন্দ্বীপ এর ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মাইটভাঙ্গা ও মগধারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও তারা সন্দ্বীপে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিবদমান দ্বন্দ্ব সাংসদ ও থানা আওয়ামী লীগ সভাপতির উপদলীয় কোন্দল দ্বারা প্রভাবিত। উল্লিখিত দুটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থানা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে সমর্থন করে বিধায় সাংসদের সাথে বিরোধ দেখা দেয়। এমপি'র ইচ্ছে মতো পরিষদের প্রকল্প কমিটিতে তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত না করার এবং অপরদিকে সাংসদের নিজস্ব ইউনিয়নে তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করায় একে অপরকে অসহযোগিতা করে থাকেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ততার কারণে ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের দলীয় কর্মীরা বিরোধী

রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। গবেষণা এলাকার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে দেখা গেছে চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টির সমর্থক ছিলেন। স্থানীয় সাংসদের কাছ থেকে ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। মূলতঃ জাতীয় রাজনৈতিক দল ও সরকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বিরোধী মনোভাবের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে নেতারা ইউনিয়ন পরিষদকে নিজেদের ক্ষমতা চর্চা ও সুসংহত করণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্পর্ক

ইউনিয়ন পরিষদের অধিকাংশ চেয়ারম্যানই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় সাংসদের সাথে তাদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সম্পর্ক লক্ষণীয়। সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির প্রত্যাশা কিংবা কোন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দের তদবির, সরকারিভাবে প্রদত্ত টিউবওয়েল ও অন্যান্য উপকরণ বরাদ্দ সহজতর করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের প্রভাব ও ক্ষমতাকে সীমিত করা প্রভৃতি কাজে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন। ১৯৮৩ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিরা ইউনিয়নের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সহায়তা কিংবা সুবিধা পাবার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের কাছে তদ্‌বির করে থাকেন[৮]। উক্ত গবেষণার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান গবেষণায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

গবেষণাধীন মেদনি, কাইলাটি ও মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নে দেখা গেছে পরিষদের পুরুষ সদস্য এমনকি নারী সদস্যরাও প্রকল্প বণ্টনে চেয়ারম্যানের পক্ষপাতিত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ জানাতে সংসদ সদস্যের দ্বারস্থ হচ্ছেন। অপরপক্ষে সংসদ সদস্যগণও চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিজস্ব প্রভাব বিস্তার সহ তাদের পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। সংসদ সদস্য তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর গতিবিধি ও রাজনৈতিক ভূমিকাকে

সংকুচিত করার জন্য তার নির্বাচনী এলাকার অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে নিজের দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন। গবেষণা এলাকার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে স্থানীয় সংসদ সদস্য রাজনৈতিক আনুকূল্যের বিনিময়ে সরকারি সুবিধা প্রদানের প্রলোভন বা আশ্বাস দিয়ে তাকে নিজ রাজনৈতিক দলে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। রাজনৈতিক দলের কোন্দল ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি অনুদান বণ্টনকে কখনও কখনও প্রভাবিত করে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উপদলীয় কোন্দলের জের হিসেবে মাইটভাঙ্গা ও মগধারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজের দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে জানা যায়। শুধু তাই নয় পরিষদের অভ্যন্তরে সংসদ সদস্যের অনুসারীদের দিয়ে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে নানাভাবে হেনস্থা করার কথাও জানা যায়।

গবেষণাধীন উল্লেখিত ইউনিয়নে দেখা গেছে কাবিখা (কাজের বিনিময়ে কাদ্য কর্মসূচী) বিশেষ প্রকল্প আওতায় গম বরাদ্দ দিয়ে সংসদ সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। সংসদ সদস্যের এ ধরনের ভূমিকায় প্রকল্প কমিটি গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে এবং বাইরে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দেয়। সংসদ সদস্য প্রকল্প কমিটিতে তাঁর পছন্দের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সংসদ সদস্যের অনুসারী প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাঁর অনুসারী রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরকে প্রকল্প কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী হলেও পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা সদস্য হিসেবে তাদের প্রকল্প কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। তারা মনে করেন যে, সংসদ সদস্যের অনুসারী ব্যক্তিরা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা চালাবে এবং সংসদ সদস্যের অনুসারী হিসেবে প্রকল্পে কাজের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবে। গবেষণা এলাকা সন্দ্বীপে থানা উন্নয়ন কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে সংসদ সদস্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কে জানিয়ে দিয়েছেন যে কোন ধরনের সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে যেন তার সম্মতি নিয়ে তারিখ নির্ধারণ করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য ২-৩ মাস পরপর সন্দ্বীপে আসেন, ফলে প্রতি মাসে সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের

সংসদ সদস্যের আচরণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সংসদ সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যকার এ ধরনের এক ঘটনায় জানা যায় যে মগধারা ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির প্রস্তাব ইউএনও'র কাছে পাঠানো হলে সংসদ সদস্য কমিটি থেকে কিছু নাম বাদ দিয়ে নিজের পছন্দ মাফিক কয়েকজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। সংশোধিত প্রকল্প কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রত্যাখ্যান করে আদালতে মামলা করেন এবং ফলশ্রুতিতে সংসদ সদস্য কর্তৃক সংশোধিত আকারে গঠিত কমিটি স্থগিত হয়ে যায়। কমিটি গঠন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন ও সমস্যা তুলে ধরার মধ্যেই সংসদ সদস্যের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়। স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুসংহত করার জন্য সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে তাদের হস্তক্ষেপ ঘটে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বলয় বৃদ্ধি করে থাকে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদের স্বাধীনতা সংকুচিত এবং পরিষদের অভ্যন্তরে ঐক্য ব্যহত হয়ে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক

মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত। ইউনিয়ন পরিষদ কতিপয় সরকারি অ্যাক্ট বা বিধি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনে নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি করার ক্ষেত্রে অবাধ কোন ক্ষমতা প্রদান করেনি। বরঞ্চ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিপত্র জারির মাধ্যমে পরিষদের কার্যক্রম ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদে অর্পিত দায়িত্ব পালন ও অফিস পরিচালনার জন্য সচিব, চৌকিদার, দফাদার এবং কমিশন ভিত্তিতে ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন, তার বদলি কিংবা অপসারণ ও কাজের তদারকি করার ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে ন্যাস্ত। সচিবের ওপর ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ

আরোপের কোন সুযোগ নেই। ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার ও দফাদারদের নিয়োগ প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে এবং যে ওয়ার্ডের জন্য চৌকিদার নিয়োগ করা হবে সেই ওয়ার্ডের দু'জন সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু নিয়োগ প্রদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা এই নির্বাচন কমিটির হাতে নেই। তারা কেবল সুপারিশ করে থাকে যার ওপর ভিত্তি করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। এভাবে ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত কর্মচারীদের ওপর ইউনিয়ন পরিষদের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে[৯]। এভাবে কর্মী ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদের উপর মাঠ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

কর্মী ব্যবস্থাপনার মতো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয়। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বৎসরে সুনির্দিষ্ট কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদকে উপদেশ বা পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত। প্রকল্প কাজের তদারকী ও অর্থ উত্তোলনে অনুমতি প্রদানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও পরিষদের উপর স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান।

মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক ঃ কেইস - ১

গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে দেখা গেছে যে পরিষদের প্রতিনিধিরা থানা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ উত্তোলনের জন্য যোগাযোগ করে থাকে। ৩৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে থানা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার সময়ে তারা প্রতিনিধিদেরকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে থাকেন, ৩০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে কর্মকর্তারা কখনো কখনো তাদেরকে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, ৩২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন এলাকায় তাদের রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে কর্মকর্তারা সবসময়ে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিনিধিদের সাথে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সম্পর্কের এ চিত্র থেকে প্রতিয়মান হয় যে প্রশাসনের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং সেই সাথে রয়েছে অধীনস্থ করে রাখবার প্রবণতা।

মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক ঃ কেইস - ২

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বিশেষভাবে কৃষি ব্লক সুপারভাইজার ও স্বাথ্য কর্মীদের কাজ সম্পর্কে অনানুষ্ঠানিক ভাবে তারা অবহিত থাকলেও উল্লেখিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ডের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়নি। মাঝে মাঝে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের মাসিক সভায় কৃষি ব্লক সুপারভাইজার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপস্থিত থাকার জন্য মৌখিক ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের সভায় স্বাস্থ্য কর্মী ও কৃষি ব্লক সুপারভাইজারদের উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়না। স্বাস্থ্যকর্মী ও কৃষি ব্লক সুপারভাইজারগণ মাঝে মাঝে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেন। সাধারণত শিশুদের টীকা দান বা ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো সম্পর্কিত কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মীগণ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সদস্যদের যোগাযোগ সীমিত। গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র ক্ষেতুপাড়া ও কাইলাটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার সপ্তাহের প্রতি সোমবার আসেন। কিন্তু গবেষণাধীন অপর তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়মিত বসেন না বলে অভিযোগ করলেও পরিষদের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ নেই বলে জানান। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত সকল সরকারি কর্মচারীদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে সকল উত্তরদাতা (ইউপি প্রতিনিধি) মত প্রকাশ করেছেন। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি বীজ ও কীটনাশক পাবার জন্য স্থানীয় কৃষকরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কৃষি ব্লক সুপারভাইজারদের কাছে তদ্বির করে থাকেন, এ ধরনের

তদ্‌বিরের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকরা কখনো কখনো সুবিধা পেয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিরা মনে করেন স্বাস্থ্য কর্মী ও কৃষি ব্লক সুপারভাইজারদের কাজের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনগণের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হতে পারে। মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে সমন্বয়ে ও সহযোগিতার অভাব স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন ও সেবা বৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায়। মাঠ প্রশাসনের উপর ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃত্ব আরোপের সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটছেনা।

জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও এনজিও সম্পর্ক

উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক এনজিও কাজ করছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবাধিকার, গণতন্ত্রায়নের জন্যও কাজ করছে। শুধু তাই নয়, সরকারি পর্যায়ে নীতি নির্ধারণেও এনজিওরা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। জাতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণেও এনজিও উপস্থিতি সরব। স্থানীয় সরকার বিষয়ে ১৯৯১ সালে সরকার ২টি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, প্রথমতঃ শক্তিশালী সরকার গঠন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নারীদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করণে সরকারের এ ধরনের ভূমিকার ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। স্থানীয় সরকার বিষয়ে সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে দাতা সংস্থার আগ্রহ ও এনজিওদের জনমত গঠন সরকারকে প্রভাবিত করেছে। সরকারি পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে এনজিও'র ভূমিকা অস্পষ্ট নয়। যদিও বাংলাদেশে এনজিও বা বেসরকারি সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল অন্যভাবে।

মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসা সেবা এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ কার্যে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কর্মতৎপরতা শুরু হয়।

তারপর এনজিওরা টার্গেট গ্রুপ এ্যপ্রোচ পদ্ধতিতে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। আশির দশকে এই কর্মসূচি দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়। দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি তাদেরকে রাজনৈতিক সচেতায়ন ও স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোয় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য নিবিড় কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমানে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণেও বিভিন্ন এনজিও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে[১০]। এনজিও কর্মকাণ্ডের এটি একটি নতুন ক্ষেত্র। স্থানীয় নির্বাচনে সচেতনভাবে ভোট প্রদান, প্রার্থী হওয়া এবং নির্বাচিতদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দরিদ্র নারী-পুরুষের স্বপক্ষে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন এনজিও তাদের গ্রুপ সদস্যদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সহায়তা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারকে অবহিতকরণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে[১১]। এনজিও'র এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জাতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তনের বিষয়টি সম্পৃক্ত। এরশাদ বিরোধী গণ আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বপক্ষে জনমত গঠন, প্রচার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে এনজিও'র অনুপ্রবেশ ঘটে। ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে গণতন্ত্র শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করেছে, নারীদেরকে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। যার ফলে নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার সত্যিকার অর্থেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। নির্বাচন পরবর্তীকালে সরকারকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সরাসরি পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৭ জন নারী চেয়ারম্যান পদে এবং ১০১ জন সাধারণ আসনে সদস্য নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এনজিওরা নারীদেরকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে এবং নির্বাচিত নারী সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই এনজিও'র টার্গেট গ্রুপের সদস্য। নির্বাচন পরবর্তীকালে এনজিওরা ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ এবং নির্বাচিত নারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে[১২]।

এনজিও এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমগত আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এনজিওদের কার্যক্রমগত সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের কতিপয় এনজিও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি বিশেষতঃ নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এনজিওর কার্যক্রমগত সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিরা বিভিন্নভাবে এনজিও কার্যক্রমের সাথে জড়িত। গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি এনজিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করলেও মূলতঃ ব্যাপক ও বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) এর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় কার্যক্রম রয়েছে। ব্র্যাক ভিজিডি কার্ড ধারী দুস্থ মহিলাদের ঋণ দান কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করে থাকে। নারী প্রগতি সংঘ এলাকার নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা বন্ধ করতে পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে। বিএনপি এস'র কর্মীরা ইউপি সদস্য ও স্থানীয় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে নিয়ে ইউনিয়নে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং বছর শেষে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধনকৃত নামের তালিকা প্রদান করে থাকে। উল্লেখিত এনজিও প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ আহরণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। শক্তিশালী ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন এনজিও ইউনিয়ন পরিষদের জবাবদিহিতা আনয়নে জনগণ ও পরিষদের প্রতিনিধিদের সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সাধারণ জনগণের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠছে।

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণের দায়িত্ব রাজনৈতিক দল ও সরকারের কিন্তু তাদের দুর্বলতা ও আন্তরিকতার অভাব এবং দাতা সংস্থার চাপের কারণে এ ক্ষেত্রে এনজিও কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে স্থানীয়

সরকারকে শক্তিশালীকরণে সরকার ক্রমাগত এনজিও'র উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। দাতা সংস্থাগুলো এ ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তে এনজিওদের অর্থ প্রদানে অধিকতর আগ্রহী। দাতা সংস্থার চাপ ও সরকারের দক্ষতার অভাবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এনজিও সরকারের ডেভলাপমেন্ট পার্টনার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিকালে জাতীয় এনজিও'র কর্ণধারদের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন ও বিরোধিতার অভিযোগে তাদের ভূমিকা বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার এনজিও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছে। এনজিও কর্ণধারদের বিতর্কিত ভূমিকা ও সরকারের কঠোর নীতির কারণে যে সকল এনজিও ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালীকরণে কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে তাদের কার্যক্রম ব্যহত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

উপসংহার

ইউনিয়ন পরিষদকে নতুন রূপে গঠন করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার সুযোগ পায়নি। ইউনিয়ন পরিষদের সর্বশেষ সংস্কার এর মাধ্যমে নারী সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু নারী সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদানে সরকারি নীতির সীমাবদ্ধতার কারণে নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ পাচ্ছেন না। জাতীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় কল্যাণ ও চাহিদার পূরণকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে দেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সাথে মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রমের সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত না হওয়া এবং মাঠ প্রশাসনের উপর পরিষদের কর্তৃত্ব না থাকার ফলে বিভিন্ন সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোগত পরিবর্তন করা হলেও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন সাধনে এর ভূমিকার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। ইউপির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এনজিও'র নানা ধরনের কর্মসূচির বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি করছে বটে কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ রয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবেই। অথচ প্রথমেই প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত

স্বশাসিত ইউনিয়ন পরিষদ। গবেষণা এলাকার চেয়ারম্যানদের মধ্যে যারা কয়েক মেয়াদে পরিষদ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মতে সরকার পরিবর্তন হয় এবং সে সাথে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত নীতিমালারও পরিবর্তন হয় এবং প্রত্যেকেই এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। শক্তিশালী ও স্ব-শাসিত ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে অধ্যাবধি কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি যদিও এ ক্ষেত্রটি রাষ্ট্রীয় মৌল বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত।

পাদটীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।* ঢাকা, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

২. সিদ্দিকী, কামাল (১৯৮৯), *বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার।* ঢাকা; জাতীয় স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন।

৩. জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (১৯৯৯), *ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক বিষয়।* ঢাকা।

৪. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), *বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। সমাজ নিরীক্ষণ* ৬২ ঃ ৫৮।

৫. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), প্রাগুক্ত।

৬. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), প্রাগুক্ত।

৭. মহিউদ্দিন, কে. এম. ও হক, মোজাম্মেল (২০০১), *ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট।* গবেষণা প্রতিবেদন। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

৮. Choudhury, Lutful Hoq (1987), ***Local Self-Government and its Reorganization in Bangladesh,*** Dhaka : National Insititute of Local government, P. 50.

৯. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), প্রাগুক্ত।

১০. মহিউদ্দিন, কে. এম (১৯৯৭), *বাংলাদেশে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এনজিও'র ক্ষমতা ঃ গণ সাহায্য সংস্থা একটি কেইস স্টাডি।* অপ্রকাশিত এম. এস. এস. থিথিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. Hoque, Siddique (1998), ***Grassroots Democratisations in Bangladesh : The NGO Experience.*** *The Journal of Social Studies*, Dhaka University, Dhaka, 79 ; 56-57.

১২. Khan, Zarina Rahman (1999), ***NGOs and Local Government Reform in Bangladesh,*** *The Journal of Social Studies*, Dhaka University, Dhaka, 84 : 59-60.

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প নির্বাচন ঃ ধারণা ও কৌশল

এস, জে, আনোয়ার জাহিদ *

Local Level Participatory Plans and Project Preparation and Selection : Concept and Strategies

S. J. Anowar Zahid

Abstract : In Bangladesh, annual sectoral national plan are prepared on the basis of the goals of Perspective Plan and Five-year Plan. Under the braod concept of national planning, some regional and local plans are also made in order to accelerate national development. These Plans generally prepared by the professional planners and bureaucrats following the top-down approach without considering mobilisation of local resources and active participation of beneficiaries. But in the sixties, the country has experienced in local level planning through launching Rural Works Programme (RWP), Thana Irrigation Programme (TIP) and Two-tier Cooperatives programme in the government sector which deserve special mention. Moreover, some local level planning also practised by the Upazila Parishad under decentralised administration. As a matter of basic principle, local level plans should be prepared based on the demand of the local people, local problems and local resources through people's active participation. Moreover, local people should be involved in data collection process for identifying local problems, prioritisation of needs, exploring local resources and selection of suitable projects for local development. Information could be collected through participatory

---

* যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা

survey or participatory rural appraisal techniques. Rural people should also have access in implementing development projects and sharing of benefits derived from the projects. Local level participatory plans should be linked with the national and regional planning process so that it becomes people oriented.

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিকল্পিত অর্থনীতির অনুসরণে সমকালোত্তর/প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং মধ্যম মেয়াদী পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে থাকে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প আকারে বিস্তারিত সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনাবিদ, পেশাবিদ ও আমলাগণ কর্তৃক প্রণীত ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে যা 'উপর হতে নিচ' বা নিম্নমুখী (Top-down) পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। এরূপ জাতীয় ও সমষ্টিগত পরিকল্পনার আওতায় কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, যোগাযোগ, বাণিজ্য ইত্যাদি খাতওয়ারী পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়ে থাকে। প্রকল্পায়নের মাধ্যমে গৃহীত এ সকল খাতওয়ারী ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাসমূহ মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতা লাভের পর হতে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা নিজস্ব সম্পদ ও সামাজিক পুঁজি (Social Capital) এর ব্যবহার এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। যার ফলশ্রুতিতে গ্রামের স্কুল/মাদ্রাসা নির্মাণ/মেরামত বা প্রতিষ্ঠাসহ সাধারণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্যও সরকারের উপর নির্ভরশীল হবার প্রবণতা বাড়ছে। অথচ কয়েক দশক পূর্বেও আত্মশক্তিতে বলীয়ান গ্রামীণ জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে নিজস্ব সম্পদ ও সামাজিক পুঁজির মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে এবং উন্নয়নে অবদান রেখেছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিকল্প ধারার অর্থাৎ 'নিচ হতে উপর' বা

ঊর্ধ্বমুখী (Bottom-up) পরিকল্পনা বা স্থানীয় পরিকল্পনা এবং এর জন্য সহায়ক পরিবেশ। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত মানুষের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করলে নিজেদের জীবন মানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে (মজুমদার, ১৯৯১ : ১১)।

ষাটের দশকে এ দেশে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমসবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা সেচ কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ ঘটে। পরবর্তীতে সময়ে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এতে জনগণের অংশগ্রহণের নব ধারা সূচিত হয়। আশির দশকের শুরুতে প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদ এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয় যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণ সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুফল ভোগ করতে পারেন। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, বিআরডিবি, এলজিইডি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থার শর্তের প্রেক্ষিতে অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি গুরত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ঃ গুরুত্ব ও ধরন

কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ সমাদৃত হবার পর অনেক উন্নয়নশীল দেশ তা প্রয়োগে উৎসাহী হয়ে উঠে এবং প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী মূল চালিকা শক্তি হিসাবে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। পেশাজীবী ও পরিকল্পনাবিদগণ

কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনা গ্রামীণ জনগণের আশা-আকাংখা ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম না হওয়ায় বিকল্প ধারায় স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। মূলতঃ স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন বা চাহিদা ও সম্পদের প্রাপ্যতার আলোকে স্থানীয় পরিকল্পনা এবং এগুলোকে একত্রিত করে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও এলাকার আঞ্চলিক ও সমষ্টিগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে জনগণ পরিকল্পনাবিদ এবং কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪ ঃ ৪)। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং পরিকল্পনার সুফলভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত কেবলমাত্র পরিকল্পনাবিদ/পেশাদার আমলাগণ কর্তৃক দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া সংগত নহে। স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনার আক্ষরিক অর্থই হলো- যে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ নিজেরা বসে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের কাঙ্খিত ভবিষ্যত রূপরেখা সৃষ্টি করবে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে (মজুমদার, ১৯৯৯ ঃ ১০)। গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রণীত আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উন্নয়নে প্রভূত সফলতা অর্জনে সক্ষম না হওয়ায় "পল্লীর জনগণকে বিশেষ করে পল্লীর দরিদ্র জনগণকে, উন্নয়ন কাজে জড়ানো বিশেষ লাভজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ" (এসকাপ, ১৯৭৮) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্থানীয় পরিকল্পনা সরকারি এবং বেসরকারি উভয় সেক্টরেই প্রণীত হতে পারে। অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায় হতে আঞ্চলিক পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা/বিভাগ পর্যন্ত যেকোন পর্যায়ে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হতে পারে। এরূপ স্থানীয় পরিকল্পনা নিম্নোক্ত যেকোন উদ্দেশ্যে/ক্ষেত্রে/বিষয়ে প্রণীত হতে পারে। (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪ ঃ ৫) ঃ

ক) এলাকার সর্বাত্মক/আংশিক উন্নয়ন কল্পে

খ) গ্রুপ বা কমিউনিটির উন্নয়ন সাধনে (যেমন ঃ ভূমিহীন, জেলে, তাঁতি, মহিলা ইত্যাদি),

গ) খাত/বিষয় ভিত্তিক উন্নয়ন (যেমন ঃ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি)

ঘ) ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন (রাস্তাঘাট সংস্কার/নির্মাণ, স্কুল/মাদ্রাসা/মন্দির স্থাপন বা মেরামত, পুল/কালভার্ট নির্মাণ বা মেরামত ইত্যাদি)।

স্থানীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো উপরোক্ত যেকোন ক্ষেত্রে স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, জনগণের আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিসহ উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। এরূপ পরিকল্পনা গ্রামীণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যা নিরূপণ, স্থানীয় সম্পদ চিহ্নতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকে।

জনগণের অংশগ্রহণ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী সংস্থা সনাতনী পদ্ধতি অনুসরণে দাতা সংস্থা, পরামর্শকগণের (কনসালটেন্টদের) পরামর্শ ও সহযোগীতায় উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণতঃ প্রকল্প বাস্তাবয়নের পূর্বে এলাকাবাসীগণের অধিকাংশই জানতে পারে না যে তাদের সমস্যা দূরীকরনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে যাদের জন্য প্রকল্প তাদের প্রকল্প গ্রহণে মতামত দেবার তেমন সুযোগ থাকে না। অথচ সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে নিজেদের মেধা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিযে সীমিত সম্পদ দিয়ে সমস্যা মোকাবেলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এবং উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারিত হয় এবং এর ফলাফল ভোগে জনগণের অধিকারও নিশ্চিত হয় (কাশেম, ১৯৯৬ ঃ ৩)। এলাকাবাসীদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মতামত দেবার সুযোগ প্রদান করা হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ ফলপ্রসূ ও টেকসই হবার সম্ভাবনা থাকে। বস্তুতঃ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের সক্রিয়

অংশগ্রহণ ব্যতীত দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয় (পল, ১৯৮৭ ঃ ১৮)।

অংশগ্রহণ বা গণঅংশগ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, প্রকল্প গ্রহণকারী, বাস্তবায়নকারী, সুফলভোগী/ব্যবহারকারীগণের মধ্যে নানা রকমের ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্তরে জনগণের প্রণয়ন ও প্রকল্প অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যাতে সংশ্লিষ্টগণ তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে পারে। অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া একটি প্রকল্পের সুদূর প্রসারী স্থায়ীত্ব আনয়ন করে যেখানে সুফলভোগী জনগোষ্ঠী প্রকল্পের শুরুতেই তার পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং নির্মাণ পর্বে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে তাদের মেধা, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ, ধারণা, শ্রম, অর্থ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীদার হয় (পিনেডা এবং আলম ১৯৯৮ ঃ ৪)। এরূপ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির কারণে গ্রামীণ অবহেলিত জনগোষ্ঠী যেমন ঃ যুবক, মহিলা, নিরক্ষর ও অদক্ষ লোক সংগঠিতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকল শ্রেণীর লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তারা নিজ নিজ ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হবার সুযোগ পায়। প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর বক্তব্য স্থান পেলে প্রকল্পের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যেতে পারে এবং তখন এটা তাদের নিজস্ব কাজ হিসাবে গণ্য হতে পারে (আদনান এট, এল, ১৯৯৪ ঃ ২৪)।

জনগণের অংশগ্রহণের পর্যায়

স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ মূলতঃ দুটি পর্যায়ে হতে পারে। যথা ঃ ক) তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ, খ) প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন ধাপে অংশগ্রহণ। নিম্নে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য

প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট এলাকা/খাত/বিষয়ের বর্তমান অবস্থা এবং জনগণের চাহিদা জানা। জরীপ বা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমেও স্থানীয় এলাকাবাসীর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। মূলতঃ তথ্য সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনের উপর তথ্যের সঠিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নির্ভরশীল। সনাতনী পদ্ধতিতে প্রধানত ঃ প্রশ্নমালা পূরণ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, আলোচনা ইত্যাদি মাধ্যমে এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ এবং এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্টগণ প্রকল্প সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে থাকেন। অতঃপর উদ্যোক্তাগণ জনগণের উপকারার্থে একটি প্রকল্প নির্বাচন ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন এবং এতে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে এমর্মে দাবী করেন। এরূপ পদক্ষেপকে বস্তুতঃপক্ষে অংশগ্রহণ বা জনঅংশগ্রহণ কোন ভাবেই গণ্য করা যায় না।

তাই স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এমন একটি বা একাধিক পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে যাতে এলাকার জনগণ ঘনিষ্ট হয়ে খোলা মনে মত বিনিময়সহ তথ্য প্রকাশ করতে পারে। তথ্য সংগ্রহের জন্য এমন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যাতে স্থানীয় জনগণ তা সহজে বুঝতে পারেন এবং প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেকোন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বা মতামত গ্রামের/এলাকার অধিকাংশ জনগণের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দল কর্তৃক উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে যারা তথ্য/মতামত প্রদানে আগ্রহী তাদের অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের মতামত বা বক্তব্য রাখার সুযোগ পায় এবং তথ্য পুনঃ যাচাইসহ কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণের ভিন্ন মতের কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন আসে। (হুদা, ১৯৯৯ ঃ ১৩)। অবশ্য প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী, বিশেষ গ্রুপ বা পেশাজীবীর সাথে আলাদা আলাদা ভাবে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলতঃ দুই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেমন: ১) অংশগ্রহণমূলক জরীপ, ২) অংশগ্রহণমূলক

বিনিময় ও বিশ্লেষণ। নিম্নে পদ্ধতি দুটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। অংশগ্রহণমূলক জরীপ

সনাতনী জরীপে তথ্য সংগ্রহ কাজ প্রধানত ঃ পরিসংখ্যানবিদ/গবেষকগণ কর্তৃক প্রণীত পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নপত্র/ছকে তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং অতঃপর বিভিন্ন পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। অংশগ্রহণমূলক জরীপে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতায় জনগণের মতামত নিয়ে বিষয় সম্বলিত তথ্য ছক (Information Format) বা তথ্য কার্ড ডিজাইন করতে হয়। এলাকার শিক্ষক/ছাত্র-ছাত্রী, বেকার যুবক-যুবতি বা সুফলভোগীদেরকে সম্পৃক্ত করে তথ্য কার্ড দ্বারা জরীপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতায় তাদের দ্বারা নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সারণীকরণ করার প্রয়োজন হয় যাতে বিষয় ভিত্তিক এলাকার বিরাজমান অবস্থা/সমস্যা এবং চাহিদা নিরূপণ করা যায়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে পৃথক ছক ব্যবহার করে এলাকার সাধারণ তথ্যাদি এবং স্থানীয় সম্পদ সনাক্তকরণ এবং স্থানীয় সম্পদ সম্ভার (Local Resource Inventory) নিরূপণ করা যেতে পারে। স্থানীয় পরিকল্পনা বা গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পারিবারিক তথ্য কার্ড ব্যবহার করে গ্রাম পর্যায়ে তথ্য ব্যাংক গঠন বা গ্রাম তথ্য বই (Village Information Book) প্রণয়নের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

২। অংশগ্রহণমূলক মত বিনিময় ও বিশ্লেষণ

স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা/চাহিদা নিরূপণার্থে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে তথা অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু, বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের প্রধান পদ্ধতিসমূহ এবং এর প্রয়োগ কৌশল

পদ্ধতির নাম	প্রয়োগ কৌশল
ঘনিষ্টতা স্থাপন (Rapport Building)	গ্রামীণ জনগণকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে জড়িত করণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সাথে পরিচিত হওয়া ও মত বিনিময় করা। অতঃপর এলাকাবাসীর আলোচনা করে পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা তৈরী করা।
১। গ্রাম পরিভ্রমণ (Village Transect)	গবেষক/সহায়তাকারী দল এলাকাবাসীদের সাথে নিয়ে গ্রাম/এলাকার প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ব্যবহার, ফসল, গাছপালা ও সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা নেয়া এবং এসকল তথ্যাদি লেখচিত্র/ছকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদেরকে সহায়ত করা।
২। সামাজিক ও সম্পদ মানচিত্র অংকন (Social and Resource Mapping)	গ্রাম/এলাকায় বসবাসরত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবী পরিবারের অবস্থান, এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ আলোচনার ভিত্তিতে মাটিতে বা একটি কাগজে প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীদেরকে সহায়তা করা যাতে এলাকার সামাজিক অবস্থা ও সম্পদ সম্পর্কে তারা ধারণা লাভ করতে পারেন।
৩। চা-পাতি চিত্র (Venn Diagram)	এলাকাবাসীগণ মতামতের ভিতিত্তে এলাকার সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সেবা-সহায়তাগত সম্পর্ক/প্রভাবকে বিভিন্ন আকারের চা-পাতি বা ভ্যান দ্বারা প্রদর্শনপূর্বক যোগাযোগ বিষয়ক অবস্থা বা প্রভাব জানা।

পদ্ধতির নাম	প্রয়োগ কৌশল
৪। সময়রেখা/ধারা (Time line/Trends)	অংশগ্রহণমূলক আলোচনার ভিত্তিতে কোন এলাকার উন্নয়ন ধারা, দূর্যোগ, সমস্যা ইত্যাদির একটি সময় বিবর্তন/ধারার চিত্র তৈরী করা এবং এর থেকে পরিবর্তনের কারণসমূহ সম্বন্ধে ধারনা লাভ করা।
৫। ঋতুভিত্তিক বিশ্লেষণ (Seasonality Analysis)	এলাকাবাসীদের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান, শ্রম চাহিদা, রোগ ঋণসুবিধা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির অবস্থা/প্রকটতা সম্বন্ধে জানা এবং ঘটনা ভিত্তিক চিত্রায়িত করা।
৬। আর্থিক সচ্ছলতার স্তর বিন্যাস (Wealth Ranking)	এলাকাবাসীদের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে আর্থিক সচ্ছলতা/সম্পদের ভিতিতে তাদের অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস (তথা ধনী, মধ্যবিত্ত, গরীব ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত) করা। এরূপ স্তর বিন্যাস সামাজিক মানচিত্র বা বিভিন্ন ধরনের এবং শ্রেণীর ছবি ব্যবহারের মাধ্যমে করা যায়।
৭। দৈনিক কাজের রূপরেখা (Daily Activity Profile)	কোন এলাকার জনগণের শ্রেণীভিত্তিক (যেমন ঃ পুরুষ ও মহিলাদের) দৈনিক সময় ব্যবহার সম্পর্কে জানা।
৮। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার বিন্যাস (Problem Identification and Preference Ranking)	বিভিন্ন শ্রেণী স্তরের বাসিন্দাদের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যার প্রকটতার নিরূপন করা। সমস্যা ও ক্যাটাগরীর বিপরীতে মতামত গ্রহণের মাধ্যমে মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সমস্যার অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।

সমস্যা বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প নির্বাচন

অংশগ্রহণভিত্তিক জরীপ ও মত বিনিময় এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করতঃ ঐক্যমতক্রমে গ্রাম/এলাকার মূল সমস্যা (Core Problem). এর কারণসমূহ (Causes) নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর মূল ও অন্যান্য সমস্যার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট প্রভাবসমূহ নিরূপণ করতে হবে। মূল সমস্যা, এর কারণসমূহ এবং সৃষ্ট প্রভাবকে সমস্যা বৃক্ষ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যেতে পারে। এ সমস্যা বৃক্ষ সমস্যা দূরীকরণের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ হিসাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং উন্নয়ন লক্ষ্য প্রণয়নে সহয়তা করবে। কোন এলাকার বিরাজিত সমস্যাদি ঐ এলাকায় গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে। কোন এলাকার চিহ্নিত সমস্যাবলী দূরীকরণ/ কমানোর জন্য ভিন্নমুখী একাধিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এলাকাবাসীগণ পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যার অগ্রাধিকার নিরূপণ করবে এবং তাঁদের নিজস্ব/স্থানীয় সম্পদ এবং সম্ভাব্য বহির্সম্পদের ভিত্তিতে সর্বাধিক লাভজনক একটি কর্মকাণ্ড/প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এলাকার সমস্যাবলীর আলোকে একাধিক প্রকল্প বা বিকল্প গ্রহণের সুযোগ থাকলে বিকল্প বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতে পারে। এরূপ প্রেক্ষাপটে প্রতিটি বিকল্প থেকে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা, আয় অর্জন, ব্যয় সুবিধা, প্রয়োগ যোগ্যতা ও স্থায়ীত্ব, পরিবেশগত দিক, ব্যবস্থাপনাগত ও কারিগরী দিক ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে। এ সকল বিষয়ের বিপরীতে অংশগ্রহণমূলক মতামত, গুরুত্ব প্রদত্ত মান বিবেচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং করতঃ লাভজনক একটি প্রকল্প নির্বাচন করা যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	প্রকল্প নির্বাচনের নির্ণায়ক (Indicators)	গুরুত্ব প্রদত্ত মান (Weighted Score)	বিকল্পসমূহ		
			প্রকল্প-ক	প্রকল্প-খ	প্রকল্প-গ

অবশ্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ফলপ্রসূতা ও যথার্থতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহের কারিগরী, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা করতঃ তন্মধ্যে সর্বাধিক লাভজনক একটি প্রকল্প নির্বাচন এবং তা বাস্তবায়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপসংহার

স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও সৃষ্ট সুফলভোগে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যাদের জন্য উন্নয়ন তারাই উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং নিজদের মেধা ও প্রাপ্য সম্পদের ভিত্তিতে নিজেদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। পরিকল্পনাকে জনমুখী করার জন্য জাতীয় পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় পরিকল্পনার যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার এবং রহমান, মোঃ মিজানুর (১৯৯৪), *স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল,* বার্ড, কুমিল্লা।

এসকাপ (১৯৭৮), *লোকাল লেভেল প্লানিং ফর ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভলাপমেন্ট, রিপোর্ট অব এ এসকাপ গ্রুপ মিটিং ৬-১০* নভেম্বর, ১৯৭৮ ইং।

মজুমদার, বদিউল আলম (১৯৯৯), *প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে পকিল্পনা ও সহায়ক পরিবেশ,* উজ্জীবক বার্তা, ২৩তম সংখ্যা, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, ঢাকা।

পিনেডা, ভিক্টোরিয়া আর এবং আলম, খুরশিদ (১৯৯৮), *গ্রামীণ সড়ক ও উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে (আরআরএমআইএমপি-২) ব্যবহারকারীগণের অংশগ্রহণ,* স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

আদনান এট, এল, (১৯৯৪), *জনগণের অংশগ্রহণ ঃ ফ্যাপ প্রসঙ্গে এনজিওদের ভূমিকা-একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন,* রিসার্চ এ্যান্ড এ্যাডভাইজরী সার্ভিসেস, অক্সফাম-বাংলাদেশের উদ্যোগ, ঢাকা।

পল, স্যামায়েল (১৯৮৭), *কমিউনিটি পার্টিসিপেশন ইন ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট,* দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।

কাশেম, আবুল (১৯৯৬), *স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা ঃ জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা এবং সম্ভাব্য কর্মকৌশল,* ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিউম-৯, নং-১ ও ২ জানুয়ারী ও জুন ১৯৯৬ ইং।

ISSN 1605-2021

LOKPROSHASON SAMOEEKY
Vol. 20, September 2001, Asshin 1408

Privatization of State Owned Enterprises (SOEs) in Bangladesh (1975-1999) : Background, Concepts, Progress of Implementation, Case Studies and Issues

S. M. Zobayer Enamul Karim*

Abstract : Privatization has become an indispensable need of the day world wide, whether it is in the develop world or in the developing one. As a method of altering the structure of economics, privatization has been embraced throughout the world by government ranging across all political persuasions. Global recognition of the free market economy and economic liberalization prompted governments in Bangladesh to pursue a series of reforms under its structural adjustment program, promoting private sector development in various sectors of the economy such as manufacturing, finance, transport, telecommunication, energy and power. Over all performances of State Owned Enterprises (SOEs) are deplorable and these enterprises made losses of crore and crores of Taka which could be used for poverty alleviation, providing clean water, sewerage, hospitals, schools, roads, bridges etc. and in general for the welfare of the common man. Realizing the significance of privatization the effort of privatization began in Bangladesh in the mid-seventies. This article attempts to highlight the background and conceptual issues of SOEs, examine the progress of implementation of privatization programmes in different rounds, find out the major issues including case studies and constraints of privatization etc. followed by suggestions to overcomes the existing problems. Most of

* Senior Research Officer, BPATC, Savar, Dhaka

the findings of the article are based on secondary information.

Introduction

The privatization concept is considered to be the most revolutionary innovations in the realm of economic polices of modern times. The world of nineteen-nineties is a virtually new world. The post cold-war era, heralded by the demise of the Soviet Union and dramatic collapse of the one-party socialist politico-economic order in Eastern Europe-witness an entire system crashed to destruction on account of internal weaknesses. The bipolar international order disappeared ever as the nineties began.

The global wave is now in favour of freedom and participation, free enterprise and market-friendly economy, increased emphasis on privatization and role of private sector trade, commerce and industry throughout the world (80 countries around the world privatized more than 8500 SOEs during the last 12 years). The democratic, multi-party, market-friendly west emerged as the apparent sole arbiter of the destiny of our planet; Bangladesh is very much within this orbit.

In Global perspective, Privatization is rapidly recognised as an effective tool of economic transformation and development. It may be one of the most important trends in economic development in the coming decade. Privatization have covered a wide spectrum of geographic and economic sectors in different countries at different stages of development over the last five years. Latin America moved more comprehensively and rapidly on privatising its economy than other regions in the world. Mexico has activated sales of railways and petrochemical

plants; Brazil arranged sales of banks; utilities and mining companies; and in Argentina and Peru political leaders whose policies incorporated strong commitment to privatisation. The privatisation programme has also gained momentum in number of Asian, African, Middle East, Central & Eastern European countries. The economic benefits of privatisation are generally accepted, and are sought in many nations throughout the world. These benefits are especially important to Bangladesh and similar developing countries[1].

The increased emphasis in most developing countries on market oriented industrial growth, and on the enhanced role of the private sector in industry, has been a critical factor in determining the scope and nature of privatization in various developing countries. In several Asian countries such as the newly-industrializing countries of the Republic of Korea, Singapore and Taiwan province of China and the rapidly-expanding economics of Indonesia, Malaysia and Thailand as well as in a number of Latin American countries, particularly Brazil, Chile, Mexico and Argentina, private-sector industry has constituted the principal engine of growth in recent decades. Even greater emphasis is now being placed in the private sector's role in industry in these countries, as also in most developing countries of Africa, Asia and Latin America and the Caribbean. Privatization must be viewed as an essential element of private-sector development and policies relating to privatization must be considered within the broader framework of industrialization through the private sector.

At the micro level, the impact of privatization has to be

---

1 Zakaria, S. M. (1998), Privatization Efforts in Bangladesh, A Brief Outline (mimeo), P-1

viewed interms of increased efficiency, productivity and competitiveness and inflow of new investments and technologies, both for infrastructure entities and mining, manufacturing and service enterprises which have been privatized. In most of these enterprises an important aim was to achieve major expansion through additional investments.

Privatization process is not so old as a phenomenon in the contemporary economic order has become an indispensable need of the day worldwide, whether it is in the developed world or in the developing one. As a method of altering the structure of economics, privatization has been embraced throughout the world by governments raging across all political persuasions. The question now is no more whether to privatize State-Owned Enterprises (SOEs) but with what method and how fast to do it. Practical realization of the fact that private sector can perform some activities more efficiently than the government agencies, has elevated the private sector as an engine of economic growth.

The Bangladesh Context

Bangladesh became independent in 1971 through a heroic arms struggle. The entire freedom loving people of the world including USA, the then USSR and West Europe supported the case of independence of BD. As a result, Awami League, the then ruling party being an ardent, believer of western democracy and free-economy had not only to take over abandoned enterprises but also had to nationalise almost all the key sector industries under Presidential Order (P.O.) 27, the Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 under which above 700 industrial enterprises either abandoned by Pakistani owners or taken over from even sole or partial

ownership of Bangali nationals were put to run under 10 sector corporations (the major seven sectors corporation). Those are the SOEs of the country.

Overall performance of SOEs in Bangladesh were very much depressed and average losses reached to Tk. 2,500 crore (US$ 1 = Tk. 48) annually the rate of which is at the increase. The total losses at the end of FY 98 stood to the tune of Tk. 45,000 crore. These valuable resources could have otherwise better be used for poverty alleviation or provide extended water, sewerage, Medicare, education and communication facilities for greater welfare of the toiling masses. Profit and loss statement of BTMC, BJMC, BJC, BSEC, BSFIC and BCIC during 1985-1998 may be shown in Annexe-A.

Global recognition of the free market economy and economic liberalization prompted government of Bangladesh to pursue a series of reforms under its structural adjustment programme, promoting private sector development in various sectors of the economy viz., manufacturing, finance, transport, telecommunication, energy and power. SOEs overall performances in Bangladesh were very much depressed and in the recent times alone these enterprises made significant losses to the exchequer. The following information regarding SOEs of Bangladesh may depict the strong argument in favour of privatization [2].

- The SOEs incurred a total loss of about Taka 45 thousand crore since the independence of the country.
- At present, there are more than 200 SOEs in the country. These SOEs are incurring losses to the tune of Taka 2500 crore annually.

2. Privatization in Bangladesh (1997), Privatization Board, November 30, 1997.

- If we can stop this loss, we can build a bridge like that of Bangabondhu bridge in every two years with this money.
- The government has to provide huge subsidy every year to keep the SOEs run.
- This money for the subsidy comes from the people's pockets in the form of taxes.
- The only way to get rid off this unbearable situation is 'privatization'.
- Privatization will foster technological progress, increase productivity, create more employment and will take our nation into a more prosperous future.
- Privatization will reduce the huge expenditure of the government. With this money the government can implement various development programmes including building of new hospitals, educational institutions, roads and bridges.
- So, it is a necessity to come forward to help make the privatization programme a success.

The Private sector employs the labour rationally giving due recognition to their skills and efficiency. Total employment will usually not decline after a firm is privatized. Of course, when a SOE is obviously over staffed, privatization will bring layoffs, However, some studies on privatization revealed that employment in newly privatized companies, on average, either remains the same or increases with the divestiture. These finding suggest that the great fear of those opposing * .

---

* Maksud Khan, (1999), Labour and Management Issues and Stakeholders in Privatization-Bangladesh Experience; (memio)

Profitability of the Private Enterprises Compared with SOEs

Sector	Private Enterprises			State Enterprises		
	Total Unit	Profi table Units	Per cent	Total Unit	Profi table Units	Per cent
Textile	19	10	53	42	9	20
Engineering	16	12	75	20	9	43
Food and Allied	22	13	59	21	10	48
Pharmacaeticals and Chemical	16	13	81	23	14	61
Jute	12	4	33	30	NA	NA
Miscellaneous	48	41	85	53	26	49
Total	133	93	70	189	67	35

Source : World Bank Report on Bangladesh Privatization and Adjustment; March 10, 1994 (Page-19)

Bangladesh envisaged three potentially large benefits of privatization : first, stemming the increasing losses of the SOEs; secondly, improving the efficiency and quality of services provided by SOEs, and thirdly, signailing to the private sector the Govt's commitment to the irreversibility of the pro-market reforms. The question to Bangladesh, is therefore, not whether to privatize or not, rather the only question is what will be the modality of privatization and how quickly it could be done.

Under P.O. 27 of 1972 and the then spectacular socialistic pattern of economy not only restriction was imposed to own enterprises in almost all of important key industries like jute, textiles, sugar, etc. on private hands, moreover bar was put to investment above ৳ 1.5 million by

private entrepreneur in any single industrial enterprise. The industrial policy 1973, 1974 and 1975 raised that investment ceiling to ৳ 2.5, ৳ 30 and ৳ 100 million respectively and industrial policy 1978 abolished (withdrawn) the highest ceiling of private investment.

Under New Industrial Policy (NIP) 1982, industry was grouped in three groups : (i) a small reserve list for public sector investment only, (ii) a concurrent list of large industries for both public and private investment (iii) an Industrial Investment Schedule (IIS) for all other industries opened to private investment. The Revised industrial policy (RIP) of 1986 further liberalised sanctioning procedures, increased incentives for local and foreign investment, rationalised fiscal and monetary measures like import-export incentives, tariff rates, etc. It kept only seven sectors reserved for public investment e.g., (a) Arms, ammunitions and other defence equipment's and machineries (b) Power generation (except through private generator), transmission and distribution (c) Forest plantation and mechanized extraction within the bounds of reserved forests; (d) Telecommunications (excluding distribution and services); (e) Air transportation (excluding cargo) and Railways; (f) Nuclear energy; and (g) Security printing (currency note) and minting. The industrial policy, 1991 raised investment ceiling in the small-scale industries from ৳ 1.5 crore (4.5 crore with BMRE) along a host of incentives to attract the flow of local and Foreign Direct Investment (FDI). For foreigners and non-resident Bangladeshi's following investment facilities have been made available:

a) 100% foreign equity holding; (b) repatriation of all post tax dividends, capital, and capital gains; (c) employment of expatriate technical and professional personnel; (d) remittances of 50% salary of foreign nationals employed in local companies; (e) remittances of savings from

earnings, retirement benefits, personal assets of individuals employed on retirement/termination of service; (f) exempted from income taxes for first 3 years of employment; (g) multiplentry visas; (h) relief from double taxation; (i) reinvestment of reportable dividends is treated new investment; (j) unhindered access to local banks and financial institutions for long-term loans and working capital; (k) ownership in the form of private limited companies and optional public offering of shares in case of public limited companies; (l) to invest in shares and securities through stock exchange etc. The Foreign Investment (Promotion and protection) Act, 1980 provides legal cover to all foreign companies operating in Bangladesh against Nationalization and for equitable treatment. Bangladesh is also a signatory of Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) of the World Bank Group, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) and International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) to cover all sorts of risks. Besides, BOI and host of other government agencies are there either to promote or regulate industries, like BDCIC, BEPZA, BSB, EPB, BHB, Sericulture Board, NPO and BITAC. The government has shifted its role from regulatory to promotional as a prove to which earlier department of industries has replaced by BOI headed by the Prime Minister of the country for speedy implementation of new industrial projects and provided all operational support services in a package form under one roof.

The first step of privatisation began in the mid-seventies which covered very small units that were initially taken over following the departure of the Pakistani owners. The second phase of privatisation (or denationalisation) took place in the first half of the 1980s and covered mostly jute and textile mills owned originally by Bangladeshi citizens prior to Independence. In these transfers, the government, under a mutually accepted agreement, retained the right

to intervene in certain areas if the new owners did not maintain the units in operation or failed in their contractual obligation. The second half of the 1980s saw further efforts to encourage the wider participation of investors in the privatisation process. Accordingly, 34 percent of the share of a few profitable manufacturing SOEs and NCBs were sold to the public, and 15 percent were allocated for allotment to employees of each of the SOEs concerned. However, this program was not deemed to be a success. With the governent still retaining 51 percent of the shares. There was no significant improvement in operational efficiency [3].

CONCEPTUAL ISSUES

It is important to classify the conceptual issues so that the readers can understand the contents of the report. The key concepts around which the study is built are : Privatization and Public/State Owned Enterprise.

Privatization

"Privatization" is generally used to mean the formation of a company's Act and the subsequent sale at least 50 percent of the shares to private shareholders. However, the underlying idea is to improve industry performance by increasing the role of market forces. Many other measures can contribute to this, notably forcing of entry to an industry encouraging competition and permitting joint ventures to create several successor companies, which may be publicly owned [4].

---

3. Zakaria, S. M. (1998), Privatization Efforts in Bangladesh, A Brief Outline (mimeo) P.2.
4. T. L. Samkor and others (Edtd.), Public Enterprise Policy in India and U. K. in 1980s, Himalaya Publishing House, Bombay, January, 1987. p-191.

How to Approach Privatization : Ten Propositions and Caveats [5].

The following is a set of general thoughts to keep in mind while reading this study :

1. Privatization is often more influenced by political issues than by strictly economic considerations.

2. Privatization and divestiture are not synonymous. Divestiture is only one type of privatization and is perhaps one of least attractive and least utilized methods. There are "many roads to privatization," just as there are to its counterpart, socialism.

3. Privatization is too often associated primarily with questions of equity, particularly in developed countries; but privatization of a function or service can, at times, be just as important. A good illustration of this has been the privatization of fertilizer distribution in Bangladesh.

4. One should approach this subject from the standpoint of privatization of an economy, not merely the unloading of inefficient, money-losing state enterprises. Privatization should be undertaken to develop viable enterprises and a more vibrant economy, not simply to cut state-owned enterprise (SOE) losses or reduce government deficits.

5. A government's privatization policy will be ineffective unless it is preceded by a well thought-out plan with clearly defined long-range objectives, backed up with will and commitment, and implemented through an effort that is comprehensive, co-ordinated and consistent.

6. Privatization of state enterprises will accomplish little without parallel government-sponsored policies and programs to encourage, assist, and co-operate with the private sector. The government as an economic partner,

---

5. Clare E. Humphrey, Privatization in Bangladesh: Economic Transition in poor country UPL, 1992 page 8-9.

not a competitor, must view the private sector. Establishing conditions that generally promote the benefits of competitive market forces is crucial to the success of privatization.

7. Privatization should be approached as a policy-oriented subject, not a bookkeeping problem. Zeroing in initially on the individual state enterprise often obscures this basic fact. It also places the cart before the horse. Analysing the policy framework and regulatory environment within which privatisation and the private sector must operate is infinitely more productive than "calling in the investment bankers" or "looking into the books" of public enterprise that are likely candidates for unloading.

8. The approach to privatization should be pragmatic, rather than ideological, with the emphasis on "what will work in this society, this bureaucracy, this situation." Fortunately, pragmatism has been more displayed by LDC governments than by some of their privatization sectors from developed nations.

9. There is no standard formula for privatization. Conditions, problems, strategies and solutions will vary from country to country, although many of the more basic privatization issues appear almost everywhere, transcending cultural barriers. Innovators should empathetically privatization efforts to local situations, while guarding against the tendency of traditional societies under-going painful transition to use distinctive circumstances and socio-cultural patterns as a shield to avoid taking action on needed change.

10. Privatization is a means, not an end; and it is not a panacea for solving all the ills of a sick economy. Privatization is fraught with political, social, and economic problem and risks; its impale mention is characterized by nagging uncertainties and few short-term victories; it is an untidy business.

If all these were true, why would any government leader in his right mind opt to follow a course of privatization ? They are doing so in increasing numbers for the same reason that people choose democracy or surgical operations - while not completely reassuring or satisfying, they (and privatization) are preferable to the alternative.

Types of Privatization [6]

As we have pointed out, divestiture by selling the entire enterprise by open tender or to selected buyers is not the only way to transfer government assets or functions to the private sector. Some of the other methods are :

1. Partial divestiture : Partial divestiture can involve sale of a particular unit of a particular SOE, but is usually concerned with sale of a percentage of the SOEs shares. Sale of minority shares is sometimes criticised as not really being privatization, but merely as a way to raise money from the private sector. But if it is used to help build a capital market where none previously existed and is aimed at eventual majority private ownership, this method can be productive, up to a point.

2. Break-up : Break-up usually involves selling or spinning off sections of large SOE, i.e. units that can be viable on their own. Marketing arms are frequently good candidates, because sales and marketing are areas where government is usually fairly inept. Splitting of commercial and policy or promotional functions is increasingly favoured. Additionally, SOEs are often umbrella organizations for a variety of disparate units that have little relation to one another.

3. Liquidation or closedown : To liquidate is a difficult decision for a government,. because it involves admitting a failure. Sometimes, this tactic involves the establishment of a new private counterpart. It also

---

6. Ibid., p. 15-18.

necessitates unloading government assets at fire sale prices, with inevitable public criticism. Liquidation does, however, have the one saving grace of putting an end to continuing losses, while putting some each in the till.

4. Marginalization : This sometimes called 'quiet liquidation.' It involves freezing or gradual reduction of an SOE's budget or operations, while slowly building up a replacement in the private sector. This method is proving useful in many cases. It is politically less volatile than outright divestiture. The long-term returns are greater, though short-range costs can be higher, since two entitles must be supported during the early stages of the process.

State Owned (SO)/ Public Enterprises

In order to provide a framework for the study, it is essential to define the term "public enterprises". There exists considerable confusion in the use of the term. United Nations has defined it as "Public or state owned and / or controlled enterprises which are (i) incorporated public corporation i.e. by virtue of company acts or other public acts and (ii) large unincorporated units (government enterprises) that sell most of the goods they produce to the public[7]". "L. p. Jones defines public enterprise as a productive entity which is owned and / or controlled by public authorities and whose output is marketed[8]". Sobahan and Ahmed define a public enterprise as" a productive entity producing marketed goods and services with an explicit or cost extractable budget covering at least fifty percent of current cost from current sales and under the decision making control of the government or its appointed bodies[9]. Praxy Fernandes explained the concept of public enterprise in the following

7. United Nations (1968). A System of National Accounts, p. 78
8. Leroy p. Jones, Public Enterprise and Economic Development : The Korean Case (Seoul, 1975), p. 23.
9. Rehman Sobhan and Muzaffer Ahmed, Public Enterprises in an Intermediate Regime : A Study in the Political Economy of Bangladesh (Dhaka : KIDS, 1980), P. 267.

way[10]. Public enterprise has two dimensions : (1) a public-state dimensions and (2) an enterprise dimensions.

(1) The state - public dimension : There are four basic elements in this dimensions : (i) State public ownership, (ii) State public purpose, (iii) State public control and (iv) Public accountability.

(2) The enterprise dimension : This dimension has the following characteristics : (i) the organisation producting goods or services, (ii) marketing goods or services at a price, (iii) earning revenues covering costs, (iv) based on the entrepreneurial idea of investment and return and (v) maintaining a set of commercial accounts : (a) a balance sheet (assets and liabilities of the enterprise) and (b) a profit and loss account.

Types of State Owned (SO)/ Public Enterprise

Broadly speaking, the following three principal types of SO/Public enterprises can be identified[11] :

(a) Departmental Undertaking : These are basically extension of the government and are normally outcome of executive decisions. Their budgets are integrated with the government budget expenditures of these department undertakings are met out of government budget and their revenues go into the national exchequers. Financial and other management rules and procedures by and large conform to those obtaining in government departments and the employees are government servants and are subject to the same or similar service rules and salary structure. Departmental undertaking do not normally have a management board, generally a chief executive is appointed by the Ministry and he is directly responsible to

10. Praxy Fermandes, Managing Relations Between Government and Public Enterprises : A Handbook for Administrators and Managers (1986). pp. 14-15

11. This section draws heavily from M. 11 Rashid : "Public Enterprises in Bangladesh. A survey", Bangladesh Journal of Public Administration, Vol. 1, January, 1988, P.

the Ministry. These enterprises are subject to all controls as in normal for a government department. Bangladesh Railways, Radio Bangladesh, Bangladesh Post Office, T&T Board etc. are some of the examples of departmental undertakings.

(b) Statutory Public Corporations : These are established either through an Act of the Parliament or in its absence by an executive order of the President or an Ordinance. These corporations are separate legal entities, having an authorised capital and are empowered to define their own rules and regulations and prepare their own budgets with the approval of the government. These bodies enjoy a measure of autonomy in taking a number of day-to-day management decisions. The corporations normally have management boards appointed by the government. The persons employed in the corporation are generally not government employees, although the chief executive is normally a government servant. They are empowered to acquire assets, enter into business contracts, borrow and lend funds, apportion the surplus from the enterprises and undertake ancillary activities with the concurrence of the government. There are 50 public corporations in Bangladesh.

(c) Public Limited Companies : These are established under the companies Act, 1913 (Act VII of 1913) which also governs private enterprises. They have separate legal status like private companies and are either fully or partly owned by the government. A public limited company can be formed by a minimum of seven shareholders and there is no maximum limit on the number of its shareholders. They have their own Board of the Directors, which may comprise of members from the ministries and corporations appointed by the government as well as private shareholders. The employees of the companies are

not government employees and their budget is even less supervised and controlled by the government. There is more entrepreneurial freedom and the companies are designed to operate with the norms of private business. As an example of a public limited company, mention may be made of Eastern Cables Ltd. under BSEC, which was incorporated, into a Limited Company on 18.12. 1986 with an authorised share capital of Tk. 60 crore divided into 60 lakh ordinary shares of Tk. 100.00 each. Paid up share capital of the company has been fixed at Tk. 20.00 crore divided into 20 lakh ordinary shares of Tk. 100.00 each as per distribution shown below :

(i) Group 'A' : 51%: Tk. 10.20 crore divided into 10,20,000 ordinary shares of Tk. 100.00 each to be sold by the government / BSEC for each as well as non-cash consideration.

(ii) Group 'B' : (a) 34% : Tk. 6.80 crore divided into 6,80,000 ordinary shares of Tk. 100.00 each to be issued for cash consideration and (b) 15%: Tk. 3.00 crore divided into 3,00,000 ordinary shares of Tk. 100.00 each to issued to the workers and employees of Eastern Cables Ltd. for cash consideration [12].

Bangladesh manifests the existence of these three basic types of state owned public enterprises e.g. departmental undertakings which operate directly under a ministry or an agency as an extension of the government function and are creatures of executive decisions; wholly owned public corporations with seed capital provided by the government but who are autonomous in respect of their budget, asset ownership, modes of operations, procurement of fund withing the broad rules and

---

12. Bangladesh Steel and Engineering corporation : Annual Report 1986-87, pp. 26-27.

directives of the government; and public limited companies operating under the Companies Act [13].

Types of SOEs Suitable for Privatization [14]

After the goals and objectives of privatization are planned out, one of the primary tasks is to select which SOEs are suitable for privatization. There are four types to consider. They are SOEs that are :

1. sound and profitable
2. basically sound, but not presently profitable
3. profitable, but basically unsound
4. neither profitable nor sound

Only the first two are good candidates for privatization. The first choice of most government is usually number four. Unloading of such "dogs" is a mistake. The basic purpose of privatization should be to strengthen an economy, not just relieve the government budget. The third is not a good choice. Such SOEs have profitable avoided losses mainly because of subsidies or preferential treatment that would not be provided to a private company.

Even the second type is a marginal choice to be implemented only if it appears that through more efficient management, trimmed staff, improved marketing and the like, the firm can perform better in a competitive market. Most countries have not learned from Malaysia, Vietnam and Taiwan that greater long-range benefits for all concerned will result from transferring profitable properties that will contribute to the economy and breed confidence in the business community that the

13. Muzaffer Ahmad, State and Development : Essays on Public Enterprise (1987), p. 23.
14. HUMPHERY, CLLARE E., PRIVATIZATION IN BANGLADESH : ECONOMIC TRANSITION IN A POOR COUNTRY, UPL, P. 15

government is serious about promoting economic growth through privatization and private sector activity.

Proper handling of the privatization transaction is another key step in this complex process. The negotiations must be conducted with scrupulous attention to fairness, and honesty. The valuations of assets and setting of a sales price that is mutually advantageous are most important. The tendency of government auditors is to set the price too high in order to avoide accusations that the government is giving away the country's patrimony to rich cronies and power brokers. The treasury deserves a fair return, but the buyer must not be burdened with obligations that put survival of the enterprise in doubt from the outset.

Privatization Scenario in Bangladesh

- Privatization effort really began in Bangladesh in the mid-seventies. The first round of privatization covered very small units and business firms. which were initially taken over by the government after liberation. Some 120 SOEs were returned to their owners by 1975. During the period of 1976-1981, 225 units were privatized.
- The second phase of privatization (or denationalization) took place in the first half of the 1980s and covered mostly jute and textile mills owned originally by Bangladeshi citizens in pre-liberation period.
- The Industrial Policy of 1982 initiated a major step towards privatization in Bangladesh. The jute and textile industries were partially denationalized. A total of 222 State Owned Enterprise (SOEs) were privatized during the period of 1981-1985.

➢ During the period 1976-1993 about 500 SOEs had been sold or returned to their former owners. Statement of the privatization performance may be shown from the following matrix :

Table-1 : The Matrix Shows the Number of Units Privatized During 1976-93 with Balance Unpaid and Recoverable Amount of Money

(Taka in crore)

Sl. No.	Description	No. of units sold	Sales price	Money received as sales price	Monthly recover able	Balance unpaid by the buyer
1.	Units from which full rate price received	469	184.92	184.92	-	-
2.	Defaulters for instalment payment	19	37.82	17.09	-	20.73
3.	Regular instalment payer	2	8.68	8.05	0.63	-
	Total	490	231.42	210.06 (90.77%)	0.63 (0.27%)	20.73 (8.96%)

Source : Privatization Board and Monitoring Cell, Ministry of Finance.

The above table-1 depicts that 490 industries have been sold out to the private entrepreneur, 3 out of these 490 have been sold by the PB (After March, 1993) and the remaining 487 were privatized during the period of 1976-93, by the Ministry of Industries and ICOP. The table also reflects the fact that the purchasers of 469 industries have paid the full payment of Tk. 184.92 crores whereas purchaser of 19 industries as defaulter in payment of remaining sale value and a sum of Tk. 20.73 crore are

still outstanding to them. The purchasers of 2 industries are regular in payment by instalments and they can not be said defaulters.

The actual picture of privatization in the period of 1976-93 is that the Ministry of Industries and ICOP sold out 503 industries and 1 by Bangladesh Shilpa Rin Sangstha against their outstanding loans. Later on 14 sold out industries taken back from the purchaser for default in payment and out of these taken back industries the PB after its creation, sold out 3 industries and now 11 taken back industries remained in the hand for selling out. Since the creation of PB as the special agency in March 1993 by the government to implement the programme of divestiture of SOEs, till May 1999, 35 SOEs got the final approval for sale from the GOB. It is worthy relating the fact that after the creation Privatization Board, only 17 (seventeen) SOEs were handed over to the private sector. Among the SOEs, 12 were handed over during the period of 1993-96 and another 5 were handed over during 1996-98. It is evident from this finding that PB has able to privatize less than 3 enterprises per year during the period from March 1993 to May 1999 (Annexe-B). The government decided to off-load 9 (nine) public limited companies share in the stock exchanges were made (Annexe-C). During the month of May 1997 Privatization Board had issued LOI (letter of indent) for 9 (nine) SOEs to be handed over the buyers after final approval of the highest authority (Annexe-D). Besides, it was not possible to hand over two enterprises in private sectors due to cases in court (Annexe-E). For the year 1999 the Board has identified 5 enterprises for Privatization. Due to lengthy and complex process of handing over some of the privatised units already sold to the private enterprises have not been handed over even after 5 years of acceptance of the bid and down payment made by the party. It may be mentioned here that 54 SOEs was enlisted to be privatized by 1999.

Case Study : In this connection the cases of Sylhet Textile Mills, Chittagong Steel Mills (CSM) Ltd. and Pragoti Industries ltd. have been presented to realise the situation of the public enterprises. These cases may help to the SOEs. It is worthy to note that except Sylhet Textile Mills, the other two enterprises are in the list to be privatized by the government.

Case Study-1 :

Sylhet Textile Mills, Sylhet : Sylhet Textile Mills Ltd., was installed by the GOB in 1978. It is established in eastern part of the Sylhet town and 3 k. m. far from Sylhet railway station. In between railway station and Textile mills, the river Surma is flowing and only one old bridge had been connecting all transportation till the second new bridge has been built in 1985. The reason of mentioning the fact that the place of textile mills might be selected beside railway station which could save a lot of transportation cost of the mill. However, the mill has been bearing a great amount of loss since its inception and now a days it is declared 'closed sine die' from last year (1998-99). In early nineties it was remarked for privatization, but only for political pressure it has been removed from the list of privatization. Now the mill is closed. but 8 officers, 109 staff and 504 workers are getting their salary/wages per month without doing any work. The machineries are going to be damaged and depreciated by carelessness and without maintenance.

Assets of the Mill : This mill is completely 'cotton yarn' productive mill, which has 25,056 number of spindle and installed capacity is 25,000. It has 28.81 acre of land, 1,47,562 Sft. pacca building, 14,151 Sft. semi pacca and 5,216 Sft. katcha building. On 30th June, 1998 its fixed money was 31.66 crore Tk. and 2.28 crore Taka of current account. On the other hand its liabilities also a great

amount of money, which is 23.83 crore taka of long term and 10.81 crore taka of current debt in the bank. The calculation revealed that liability is greater than its asset excluding land, building and machinery.

Statement of Last 10 Years Profit and Loss : The mill never shows any efficacy of its installation. We can present the data of last ten years, which is lamentably one statement of loss. We can assume that it was never a profitable entrepreneur and always wasting the public money. Here a ten-year statement of profit and loss is presented in a table : (Table-2).

Table-2 : Statement of Last 10 Years Profit and Loss

(In lakh Taka)

Year	Cost of Production	Sales Value	Profit/ Loss	percent
1988-89	1078.29	975.66	Loss : 102.63	9.52
1989-90	1241.80	1097.80	" 144.00	11.60
1990-91	1345.01	1151.83	" 193.18	14.36
1991-92	1499.24	1308.70	" 190.54	12.71
1992-93	1727.06	1298.80	" 428.26	24.80
1993-94	1533.90	886.19	" 647.71	42.23
1994-95	1323.20	913.11	" 410.09	30.99
1995-96	1052.71	597.83	" 451.88	43.21
1996-97	712.82	147.44	" 565.38	79.32
1997-98	678.27	199.08	" 479.19	70.65
Total/ average	12192.30	8576.44	Loss:3615.86	29.66

It is revealed from the table that in 1998-89 the loss of the mill was 9.52 percent, where in 1997-98 it stands at 70.65 percent. The average loss of 10 years of the mill is 29.66 percent. It never shows any profit and day by day

decreases towards greater loss. Now it is declared closed but still 117 staff and officers are getting their salaries and 504 labourers are getting their wages without doing any work. It is an ideal exmple of nourishing the white elephant.

Causes of Sickness of the Enterprise : Why this public enterprise is so sick ? It is an obvious question, not only applicable for this enterprise but also applicable for all of the public enterprises. Some answers have been collected from the management. They are as follows :

1. Lack of current capital or insufficient current capital for buying sufficient cotton as input of the mill.
2. The production cost raises higher when interests are imposed in every kinds of debt.
3. The market price was always lower than the production cost and there was limitation in marketing.
4. The market was always overflowed by the illegally imported cotton yarn, which was cheaper than domestic cotton yarn. As a result they were found to sell the cotton yarn in cheaper rate.
5. Lack of essential parts of machinery in the local market, which hampered the production now and then.
6. Labourer's problem (poor attendance, strike, and turbulence) also hindered the production.
7. Regular load shedding accelerated the production problem towards worse condition.

Review of the Causes of Sickness : Our country has got numerous sick enterprises mainly of three reasons. They are, inefficient management, labour problem and lack of marketing. Management inefficiency contains some basic

indicators like corruption, unskillness, nepotism, idleness and prodigality. This enterprise also bears the same management problem, which is expressed in the audit report of 1992-93. It is mentioned in that audit report that in 1992-93 (i) management wasted raw-cotton of worth Tk. 48 lakh (ii) false buying voucher of Tk. 10 thousands (iii) irregular expenditure of washing Tk. 6 thousand (iv) buying of raw materials from non-lowest bidden and loss of Tk. 22 thousand (v) non-optimum production of available looms and machineries and loss of Tk. 90 lakh. (vi) unsold production of worth Tk. 4 crore (approx), which created crisis of current capital (vii) non-appropriation of buying capital of Tk. 5 thousand; were found as illegality which should be answered immediately. But the reality is, in every year audit committee presented their reports, which did not get any answer from the management side. The top management also was well known about those irregularities but awfully did not take any action to prevent the public enterprise. We can hardly cite any example of necessary and immediate action of the kinds of irregularities in the public sector. The factory management and top management is getting their salary and other facilities regularly where the public enterprises are suffering worldly and even going to being closed.

Concluding Remarks : Sylhet Textile Mills is now completely closed and bearing a great loss in every day. Notwithstanding some politicians are trying to keep it in public sector despite of privatization. There is only one reason to them, to keep the staff and labourers in favour of them at the cost of national loss. The privatization board is not taking strict place to mitigate the loss of the country by selling it in appropriate price and save our national expenditure. It is the claim of the time to protect the national waste and sell the sick public enterprises.

Case Study-2 :

The Chittagong Steel Mills (CSM) Limited : The Chittagong Steel Mills, one of the enterprises of Bangladesh Steel and Engineering Corporation was established in 1967 as Public Limited Company. The enterprise is located at Chittagong on 222 acres of land. The major product of the enterprise is Steel ingot, Billet, Angle, Rods, GP/GI sheet BP sheet, thin and heavy plate. According to the statement of the accounts division of CSM the fixed and current assets as on June 30. 1998 were Tk. 295.82 and 100.51 crores respectively and the long-term & current liability of the enterprise were Tk. 403.52 and 553.84 crores respectively.

The officers, staff and workers as on February 17, 1999 were 153, 299 and 1351 respectively against the sanction strength 203, 315 and 1580. All the constructions are made in the form of pacca building, whereas shades are made of tin. The enterprise is connected with road, rail and river and is operated by gas and electricity. Hundred percent residential facilities for officers are available, but for the staff, there is a shortage for the same.

Table-3 : Statement of Installed Capacity and Production Performance of Chittagong Steel Mills Ltd by Items (1997-98).

(Unit in Metric ton)

Item	Installed capacity	Production Performance
Melting shop	1,50,000	10,7761(7.18)
Blooming Mill	1,30,000	7,165 (5.51)
Bar Mill	1,00,000	6889 (6.89)
Sheets Plate Mill	17,000	2359 (13.87)
Galvanising shop	50,000	2830 (5.66)
Heavy plate Mill	36,000	3418 (9.49)

(Figures in the parenthesis indicate percentage of actual production over installed capacity).

The above matrix shows that a lot of difference prevailed between installed capacity and production performance of the CSM in various items of production. The performance of production varies from 5.51% to 13.87% over installed capacity for various items of production.

Table-4 : Approved Budget and Expenditure of the CSM are Shown in the Following Matrix

(Fig. lakh Tk.)

Items	Approved budget	Actual	% of expenses less over approved budget
Variable manu facturing	4191.01	3047.86	27
Fixed manu facturing cost	2008.64	2001.77	01
Administrative Expresses	525.11	522.66	01
Selling & distributive Exp.	59.16	29.78	50
Financial Expenses (inland)	6888.46	7651.07	(11)

(Figure in the parenthesis in column 4 indicates percentage of excess expenses over approved budget).

The above matrix depicts that actual expenditure were less over approved budget except the last items.

Observation Remarks about CSM : While the authors discussing about the causes of loss of CSM with one of the senior officers of the enterprise, he mentioned that the enterprise is not only responsible for the consecutive losses, there are other factors influenced for the same Viz.

- Lack of appropriate policy of the government to protect the enterprise, the role of CSM vs. Ship Breakers Association (SBA) is one of the factors.

- Uneven quality products of the private sector enterprises i.e., quality of the products of CSM Vs. private sectors enterprise's products. Private enterprises do not bother the quality of the products and government is not interested to maintain the rationale price of the products of CSM with comparison to Private sector's goods in terms of maintaining quality.
- The market price was always lower than the production cost and there was limitation in marketing.
- The market was always overflowed by the illegal importers, their goods are cheaper than those of domestic products. As a result they were found to sell the steel product at a cheaper rate.
- Lack of essential parts of machinery in the local market which influence frequently to achieve the production target negatively.

Table-5 : Statement of Cash Credit and Bank Balance of CSM

(Fig. In lakh Tk.)

Date	Cash and Bank Balance	Cash Credit Limit	Overdraft from cash credit	LIM/LAM/ AAM	TRA/C & IP LOAN	Total overdraft and loan
As on 30.6.98	533.32	3500	3656.19	-	905.61	4561.80
As on 30.6.97	109.80	3500	3710.70	-	914.74	4625.44

Case Study-3 :

Pragoti Industries Limited : Pragoti Industries Ltd. is another enterprise of Bangladesh Steel and Engineering Corporation. The enterprise is located at Barabkund, Chittagong, and 230 KM from Dhaka City, adjacent to

Dhaka-Chittagong highway. The enterprise was established in 1966 as Public Limited Company with the area 25.5 acres of land. The major products of the enterprise are to assembling of bus, truck, ambulance, minibus, minitruck, jeep and pickup etc.

As per the information provided by the enterprise the fixed and current asset as on June 30. 1998 were Tk. 0.93 and 104.16 crores respectively, on the other hand the long-term (Bank loan etc.) and current liability were Tk. 2.35 and 98.51 crores respectively.

Officers, staff and workers as on February 18, 1999 were 104,224 and 287 (including daily basis workers) against the sanctioned strength 103,240 and 275 respectively. All the constructions were made in the form of pacca building with total area of 78,703 Sq. ft. The enterprise is connected with road, rail and rivers and it is operated with gas & electricity. Hundred percent accommodation facilities are provided for the officers and staff. The installed capacity and production performance of the enterprise are presented in the matrix below :

Table-6 : Statement of Installed Capacity and Production Performance (Actual Production) of Pragoti Industries Ltd. Over the Years (in Number).

Year	Installed Capacity	Production Performance
1990-91	2000	1303 (65.15)
1991-92	2000	1207 (60.35)
1992-93	2000	533 (26.65)
1993-94	2000	606 (30.3)
1994-95	2000	1112(55.6)
1995-96	2000	1232 (61.6)
1996-97	2000	1132 (56.6)

(Figures in the parenthesis indicate the percentage of production over installed capacity.)

The above table depicts that the actual production performance of this enterprise is better than that of CSM.

Table-7 : Comparative Statements of Profit and Loss of the CSM & Pragoti Industries. Ltd. Enterprises Over the Years.

(Fig. in Lakh Tk.)

Year	Chittagong Steel Mills		Pragoti Industries Ltd.	
	Sales Value	Net Profit/ Loss	Sales Value	Net Profit/ Loss
1988-89	18304.55	585.59 (Profit)	8559.29	1403.73
1989-90	16661.13	(2597.17)	9707.25	1393.63
1990-91	12102.50	(4993.34)	3179.80	47.04
1991-92	5241.84	(5137.55)	3099.21	(799.07)
1992-93	5827.78	(7068.77)	4599.53	(479.90)
1993-94	4473.37	(6668.41)	3960.13	(111.22)
1994-95	6650.89	(6147.35)	7018.01	195.05
1995-96	5967.29	(6072.18)	7536.10	400.13
1996-97	4588.96	(8641.45)	6603.43	333.70
1997-98	3899.53	(9903.03)	5857.81	177.31

(Figures in the Parenthesis indicate amount of losses)

It is evident from the above matrix that Chittagong Steel Mills incurred loss over the nine years and earned profit only for the year 1988-89. On the otherhand, Pragoti Industries earned profit from the financial years 1988-89 to 1997-98 except 1991 to 1993. It is evident from the table that financial position in terms of profit is encouragingly better for Pragoti Industries Ltd. than that of CSM.

Issues to Privatization

The followings may be considered as major issues of Privatization in Bangladesh

(i) Preparation and Marketing of State Owned Enterprises

Restructuring of capital (usually writing off loans, which many buyers will take over), assets (scrapping obsolete assets or selling some separately from the main business to maximise proceeds), labour (laying off surplus staff before Privatization), operation (trying to improve efficiency and thus enhance the price) and marketing (Advertisement through magazines; newspapers using the internet; using media other than newspapers etc.) should be initiated for preparing SOEs for Privatization.

(ii) Mobilisation of Financial Resources for Privatization

Finding cash for buyers is a problem. Solutions include parallel development of financial and capital markets usually by privatizing the banks, creating privatization funds, companies funded by banks and non-bank financial institutions specifically to buy minority shareholdings in privatized companies, public offers of shares, extended credit to buyers, attracting FDI and phased sale of larger SOEs.

(iii) Labour Issues Dealing With Unions : Social Safety Nets, Etc.

There are two approaches to the labour issue. One is to give a reasonable golden handshake and leave it up to the employee to find new job and another is to take positive steps to find alternative work. In France this involves setting up an employment agency in firms about to be downsized or privatized as it is easier to find a new job for someone who is employed. In Germany re-training

facilities are established in affected zones. In our country under the Jute Re-training facilities are established in affected zones. In our country under the Jute Re-training Scheme, the employees had a two weeks course in chicken farming/vegetable growing etc. as training to establish a small business. Govt. assistance for re-training takes many forms of credits to workers, costs of courses shared with companies, subsistence and travel allowances paid for workers attending. In Germany a two years course attempted to re-train factory workers as office workers. We have a project for training of affected workers of Jute Mills only. But there is no such arrangement for the affected workers of Textile Mills and other Industries. The Privatization Commission is planning to introduce a training program for the affected workers of Textile and other Industries. The objective of the program will be to develop marketable skill for alternative job, and help building up viable micro enterprise for affected workers. The growth is the best safety net as there is a direct connection between growth and poverty reduction. The scope of the program will be to asses the number of interested participation's, identity probable area of training for alternative employment accordingly. Under the program affected interested workers will also receive counselling services and required assistance in building up viable microenterprise. The Privatization Commission considers this training program very important as this will create confidence among the labour community. This will also help the Privatization Commission for implementing Privatization program smoothly.

(iv) Post Privatization Impact and the Role of Government in the New Economic Environment

Impact will be on the company enterprise which should improve inefficiency attract more investment, employees

and welfare which should improve, customers who should get better quality products and better quality of service, regulatory bodies (Government will no longer be regulating itself). Government fiscal deficits will reduce and the overall economy will improve. The role of government changes from operator to regulator. Privatization is all about re-defining the role of Government. In Bangladesh, privatization is an important element of the Government's overall market-oriented adjustment strategy, with privatization and pro-market reforms mutually reinforcing one another. With annual SOEs losses now growing realisation, not only in Government, but also among labour unions and the public, that privatization where possible is imperative and inevitable. Arresting these losses and reducing subsidies will also have potential beneficial effects on public and private investment and would allow government to allocate more resources required for poverty alleviation, social and human resource development. It has been recognised that privatization will help to improve the public credibility of the government's commitment to top interfering with production decisions in the future in which it would only be substituting for private activity. Evidence suggests that this effect of privatization is as (if not more) important as the improvement in production efficiency from privatization. Raising the confidence of the private sector, by demonstrating the Government's commitment to increase the private sectors' role in the economy is necessary for an increase in private manufaturing investment in Bangladesh. Privatization can also mobilise local as well as foreign funds for investment and develop the capability of Bangladesh stock market by increasing the number of equities listed.

Privatization will help attract new technology and management techniques associated with foreign investment and joint ventures. Finally, privatization of certain parts of the utilities and infrastructure sector will improve the efficiency of services so that they become reliably available on a timely, market-prices basis.

SUGGESTIONS/RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION

The following ***Short-term*** and ***long-term*** recommendations should be considered for enhancing the contributions that privatization and related initiatives can make towards industrial development, socio-economic change and modernization. Reformatory suggestions/ recommendations are put forward below for rightful application :

SHORT-TERM RECOMMENDATIONS

To speed up privatization process the following short-term recommendations may consider on an urgent basis :

- All political parties should have arrived at a consensus.
- Firm commitment of the government is required.
- Empowering the Privatization Commission to take decision, providing legal coverage through enactment of privatization law.
- Comprehensive awareness programme for privatisation of all service organisation for better efficiency and savings of the exchequer.
- Privatization Commission should be equipped fully to take over the project before privatisation and complete the entire process for handing over and subsequent running it by the private sector.

- Government machinery require to be re-organised to ensure efficient operation of the government and eliminating the unnecessary tires which causes obstruction in the implementation of the decisions.
- While a SOE is identified for privatization, all other stages for its eventual sale: working out legal, financial and administrative matters; valuation of the enterprise; preparation for sale; tendering process, and handing over to the private sector etc. should be streamlined.
- The steps of the privatization programme are slow. The parameters and scope of privatization has not yet been agreed upon at the highest level. The policy should provide a time frame with set goals for each stage of privatization, which would send strong signals to investors and create confidence.
- A quick but well planned privatization is better than a slow and ill-conceived privatization. Hence, a distinct privatization policy with full consensus of all concerns should be formulated to avoid any confusion or conflict.

LONG-TERM RECOMMENDATIONS

1. Re-addressing Privatization Goals and Objectives : A Cabinet level Commission should be appointed to develop a set of government's privatization efforts. The commission's report should state exactly what the government expects to achieve through privatization and how it intends to achieve it.

2. Strengthening Privatization Commission : The Privatization Commission should be made an autonomous body with its own laws and rules so that it may work on

behalf of the government and may execute any Deed of Agreement, Deed of Transfer etc. Thereby the PC will be independent and it will not be mere co-ordinator but the legal agent of the Government Simultaneously all the experienced staff working in Privatization cells in the Ministries should be placed under the control of the Privatization Commission and necessary files and papers now with the ministries should be Shifted there.

3. Selection of SOEs : Political pressures, environmental constraints, inefficient personnel often jeopardise selection of projects to privatize immediately. These have to be minimised by rationale ways. The profitable, but basically unsound and neither profitable nor sound SOEs may be selected for privatization. In selecting enterprises the authority should keep in mind that the profitable industries like-Pragoti Industries Ltd. should not be privatized, on the other hand the loss incurring enterprises viz., Chittagong Steel Mills and Sylhet Textile Mills must be privatized, which are the causes of losses and a burden of government exchequers; though Pragoti Industries & Chittagong Steel Mills are in the list of privatization and Sylhet Textile Mills is beyond the list.

4. Appropriate Tender Method : The terms & conditions and other prerequisites should be set in such a manner that people will feel free to submit tender in way of privatization. This can be done through proper study, research and evaluation.

5. Disposing the Issues of Control of the SOEs : The government should resolve the perennial controversy between the line ministries and sectoral corporations over control of the SOEs. The dispute should be resolved in favour of the sectoral corporations to ensure that : (a) SOEs are run on a more business like basis; (b) greater SOE management autonomy and accountability are

encouraged, and (c) interference in SOE operations is lessened.

6. Workers, Labour Union and Management Co-operation : Our workers, trade unions and management people of the relevant project have false notions that they will lose everything if the project is privatized, that's why they always object privatization. These people should be made conversant with the situation and if they realize the inherent meaning & no losing by privatization then they will help privatization through co-operation and dedication. So these measures should be adopted by all means.

7. Research on Labour/Employee Aspects : The labour question is one of the most volatile and sensitive issues connected with privatization in Bangladesh. The problems like comparable fringe benefits, retraining programmes, employer-employee relations, labour negotiations, and employee stock option programme (ESOP) must be addressed properly. Research should be undertaken to study these issues and make appropriate recommendations that could be used in negotiations related to privatization transactions.

8. Honest Practices of Buyers to be Introduced : Buyers often delay and jeopardise privatization process through unfair means, e.g. not making payment timely, selling of fixed assets, taking more loan against taken over mills etc. Government should take appropriate measures to protect these sorts of things and the buyers also should be persuaded with positive notions that such activities will ruin them outright. Then the situation will definitely improve.

9. Disposal of Court Cases : The cases regarding enterprises should be disposed of quickly. Otherwise, the process will be unusually lengthy which will discourage

buyers to come forward to take over privatized projects.

10. Rationale Evaluation of SOE Assets : The valuation of SOE assets is a very complex and technical matter. This is particularly true when a large enterprise is to be completely divested. Often valuation is much influcenced by political considerations as by accounting factors. All should consider that once privatized the new business should be in a financial position that gives it a fair chance to survice. If the enterprise fails because of too heavy a debt burden, no one gains. To attract the buyers in bid, maximum possible relaxation should be made in pending liabilities. The value of SOEs to be privatized also should be made with reasonable price of land and other assets. By removing legal & other regulatory constraints the PC may also win over the trust of the private entrepreneurs.

11. Public Awareness Programme and Educate the Public about Privatization : One of the main weaknesses of privatization Programmes is that insufficient attention is given to public education about privatization. More often than not particular privatization moves are sprung upon the public and workers with little or no notice. The results of such action are almost always negative. The government has an obligation to explain why it is pursuing a certain policy, and to lay out for all parties and to the whole country the benefit of the action. The PC should initiate a public awareness programme to mould public opinion in favour of privatization in the country. Through media of radio, TV and newspapers this can be done efficiently. Moreover, awareness can be more developed going in touch with the population and govt. officials in corporation and public sectors.

12. Congenial Relations between SOEs and the Private Seetor : The government should encourage public sector organisations whether they are individual SOEs or the

buyers to come forward to take over privatized projects.

10. Rationale Evaluation of SOE Assets : The valuation of SOE assets is a very complex and technical matter. This is particularly true when a large enterprise is to be completely divested. Often valuation is much influcenced by political considerations as by accounting factors. All should consider that once privatized the new business should be in a financial position that gives it a fair chance to survice. If the enterprise fails because of too heavy a debt burden, no one gains. To attract the buyers in bid, maximum possible relaxation should be made in pending liabilities. The value of SOEs to be privatized also should be made with reasonable price of land and other assets. By removing legal & other regulatory constraints the PC may also win over the trust of the private entrepreneurs.

11. Public Awareness Programme and Educate the Public about Privatization : One of the main weaknesses of privatization Programmes is that insufficient attention is given to public education about privatization. More often than not particular privatization moves are sprung upon the public and workers with little or no notice. The results of such action are almost always negative. The government has an obligation to explain why it is pursuing a certain policy, and to lay out for all parties and to the whole country the benefit of the action. The PC should initiate a public awareness programme to mould public opinion in favour of privatization in the country. Through media of radio, TV and newspapers this can be done efficiently. Moreover, awareness can be more developed going in touch with the population and govt. officials in corporation and public sectors.

12. Congenial Relations between SOEs and the Private Seetor : The government should encourage public sector organisations whether they are individual SOEs or the

offices of the bureaucracy, to co-operate with the private sector in promoting economic progress. As part of this policy, the government should strive to ensure that favouritism is not shown to SOEs over private enterprises in the allocation of resources, purchasing sales contracts and the like.

13. Privatization Law : The law of privatization should include the clause that no court will accept any case regarding power of attorney, value of stocks and stores. This is for avoiding the embarrassment for payment of due liabilities.

14. Act for Privatization : The authorities should make the forthcoming Privatization Bill available for generating public discussion before sending it the placement for approval. The act ought to ensure the transparency and credibility of the privatization process. The Boards decision will be creditable if it is subject to independent analysis and scrutiny.

15. Allocation of Fund for PB : The Privatization policy should include a clause of describing the methods for guarding the industries from all sorts of insecurities. The Board should, therefore, keep sufficient budget allocation for meeting up such expenditure.

16. Proper Environment : It is fully realized that privatization of the infrastructure not only requires strong political will, but also a great deal of technical expertise; Autonomous regulatory bodies and independent regulatory mechanisms will help environmentally to smooth Privatization and efficient transition for transfer. These also should be ensured with topmost sincerity and efforts for beeter privatization programme.

17. Research and Technical Assistance to Private Enterprises : Research and technical assistance should

be conducted in any industrial or commercial field with potential for privatization. Options for various types of privatization should be analysed, and specific recommendations made. Approaches for encouraging private enterprise activity on those fields should also be part of the action oriented research. This responsibility may be given to PB so that without depending only on the list supplied by the Cabinet Division and make correct appraisal report of the SOEs to be privatized.

18. SOE Shares : The government should continue the plan to sell shares in certain SOEs. The intend should be to eventually sell 100 percent of the shares to private investors. Present political and financial realities, and un-attractiveness of some SOEs as investment dicate that this is done in gradual stages.

19. Opposition Parties Concerns : Opposition parties attitude and Political environment must be improved through publicity, persuasion and dedication. These may lead to privatization a success.

20. Alternative Privatization Methods : The advantages and disadvantages of various methods of privatization techniques should be carefully investigated to help ensure that the appropriate method is used in each case. For example, in one case, optimum results might be best achieved by divestiture, in another case by outright liquidation, or in a third by spinning of a particular portion or function of SOE.

CONCLUSION

The above discussion reflects that implementation of privatization in Bangladesh is a difficult task, on the other hand it is a recognized fact that in the present day context

of free market economy privatization of SOEs is a compelling necessity for a country like ours where government exchequer would hardly bear any further loss which is being increased day by day. It may be mentioned here that the four major sector corporations (BCIC, BSFIC, BSEC and BSCIC) under the control of Ministry of Industries are more than responsible for losses as a percentage of GDP from 4 to 6%. Privatization in Bangladesh can be made quick, accountable and transparent if a correct and acceptable policy for privatization is formulated and followed. The recommended measures and reforms if executed can make the privatization to reach its as momentum and this in turn will definitely help the govt. to attain its desired goals of economic development and poverty alleviation. Proper execution of privatization and implementation of complementary policy steps is required to secure the presumed gains from the privatization of public enterprises. Privatization of public enterprises in Bangladesh would have to be accompanied by a set of policies which ensure that entrepreneur would profit from productive endeavours. As the prices of SOEs are very less in comparison, the foreigners can buy these projects in the way of privatization. This way they can create congenial atmosphere in the industrial sector and help Bangladesh prosper through mobilization of its resources through foreign help and co-operation.

The emergence of the private sector as a major player in the modern industrial sector has not automatically brought prosperity ~~to a~~ troubled, backward and subsistence economy. The economy is still struggling, but there are some encouraging sings, almost all of them emanating from the private sector. It is difficult to trace

the post-privatization performance of many divested firms. A native unwillingness to share financial information whether showing profit or loss-combines with the generally unsettled and unstable condition of the Bangladesh economy to frustrate the investigator.

Privatized firms must be viewed, to a certain extent, as any other private firm, although they may be burdened with residual financial or operational liabilities from their nationalized past. Some have succeeded, after have failed, and the rest are linking along. One finds just such a mixture in most developing countries.

In a backward economy like Bangladesh there are powerful adverse forces and factors with greater influence in determining an enterprise's fate than its performance. Some of these forces and factors arise from the nature of the market place in Bangladesh; some stems from the policies, programmes and procedures of the government. In our country a new class of entrepreneurs is engaging in a more varied range of economical activity because of privatization process. Privatization alone cannot bring about prosperity of a country. To be an effective instrument of change, privatization must be integrated with other economic and fiscal programmes, and backed up by consistent political will. It may be mentioned with regard to privatization, the Bangladesh government is now in what it calls a "consolidation period" indicating that additional major disinvestment are not very likely in the next few years. For the present, no government will engage in any bold ventures of privatization, while it generally will continue to encourage private enterprises. There is a general consensus among all political economists and social scientists that finally privatization is a means, and not an end in itself. As such the ultimate

purpose of privatization is not the unloading of SOEs, but the privatization of the economy. This, in turn, leads to a more varied, better balance and more vibrant economy, with greater benefits to an ever-widening segment of the society.

There is no simple formula that would work for all countries in the same manner. Because every enterprise is different and every country has a unique culture and tradition, the privatization process should be tailored to specific needs.

We have already passed 30 years without any appreciable progress in industrialisation. With a huge population the un-employment ratio has been increasing, giving rise to poverty level and with the present global trend, it would not be possible on the part of the government to combat with the challenges of the 21st century by themselves. Therefore, private sector would be required to give the boost and undertake the major development works. As such there is no alternative to privatisation, which must be achieved in all spheres with a broader perspective.

The objective of privatization policy should be to increase economic growth by better management of resources. Therefore, privatization policy/reforms would have to be accompanied, by a set of policies that ensure that entrepreneurs profit from productive endeavour rather than at the expense of the public. The policy should not regard privatization as an end in itself, but as a means towards increasing efficiency and economic growth. And above all reforms in privatization policy will bear better fruits in the days to come for which we had been aspiring since time immemorial. Really days are coming for our golden time to flourish like blazing sun.

BIBLIOGRAPHY

Zakaria, S. M. (1998), ***Privatization Efforts in Bangladesh : A brief Outline*** (mimeo), P.1

Hossain, Md. Toffazzel, (Sept.-1998), ***Privatization In Bangladesh.*** Lokh Proshashon Samaiky : Vol. 12 BPATC, Savar Dhaka.

T. L. Samkor and others (Edtd.), (1987), ***Public Enterprise Policy in India and U. K. in 1980s,*** Himalaya Publishing House, Bombay, January, p. 191.

Clare E. Humphrey, (1992), ***Privatization in Bangladesh : Economic Transition in Poor Country*** UPL. P. 8-9.

Privatization Policy (1996), Privatization Commission, Dhaka

United Nations. (1968), ***A System of National Accounts***, p. 78

Leroy p. Jones, (1975), ***Public Enterprise and Economic Development : The Korean Case,*** Seoul, p.23

Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, (1980), ***Public Enterprises in an Intermediate Regime : A Study in the Political Economy of Bangladesh,*** Dhaka : KIDS, p. 267.

Praxy Fernandes, Managing, (1986), ***Relations between Government and Public Enterprises : A Handbook for Administrators and Managers***, p.14-15.

Bangladesh Steel and Engineering Corporation : ***Annual Report 1986-87,*** p. 26-27.

Muzaffar Ahmad, (1987), ***State and Development : Essays on Public Enterprise*** p. 23.

Humphery, Cllare E., ***Privatization in Bangladesh : Economic Transition in a Poor Country,*** UPL, P. 13

M. H. Rashid, (1988), ***Public Enterprises in Bangladesh : A Survey,*** Bangladesh Journal of Public Administration, Vol. 1, January,

Savas, S. E., (1989), ***Privatization : The Key to Better Government,*** Tata MeGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.

David Steel & David Heald (edited), (1984), ***Privatizing Public Enterprises : RIPA***.

Satish K Batra & Tej K. Jain, (1988), ***State Enterprises : The Emerging Scenario,*** Printwell Publishers, Jaipur.

Arvind Gupta, (1984), ***Public Enterprises : Deep & Deep Publications,*** New Delhi.

Ravi Ramamurti Raymond Vernonn, (1991), ***Privatization and Control of State-Owned Enterprises :*** The World Bank, Washington, D. C.

R Mandal,(1994), ***Privatization in the Third World;*** Vikas Publishing House Pvt Ltd, New Delhi.

Sadrel Reza & Miazanur Rahman Shelly (1992), ***Privatizing Industrial Regulatory Functions in Bangladesh*** UPL (Dhaka).

Khan, R. Maksud. (1990), ***Labour and Management Issues and Stakeholders in Privatization Bangladesh Experience*** (Mimeo).

Annexe-A

Profit & Loss Statement Of the Corporation over the Years (All fig. in lakh Taka)

Corporations	Authrised. 98-99	Revised 97-98	Actual 96-97	Actual 95-96	Actual 94-95	Actual 93-94	Actual 92-93	Actual 91-92	Actual 90-91	Actual 89-90	Actual 88-89	Actual 87-88	Actual 86-87	Actual 85-86
1. BTMC	-3802.67 B	-8254.62 R	-16325.67	-13437.00	-11703.95	-15386.98	-13545.83	-4342.12	-5839.05	-1885.40	-220.99	-3535.90	-2445.49	-5663.42
2. BJMC	-19753.72 B	-22464.05 R	-25171.27	-9618.30	-3142.66	-6404.61	-52334.60	-31749.56	-24732.91	-37086.47	-18820.70	-14309.30	-4198.76	-15830.32
3. BJC	-88.57 B	-60.17 R	-140.95	-187.00	-629.92	-426.47	-20381.91	-16746.90	-14418.83	-13242.38	-14764.99	-18411.56	-1175.18	-16231.88
4. BSEC	-9712.93 B	-9744.53 R	-10328.33	-6150.65	-6836.37	-9032.07	-10259.53	-10778.86	-8610.76	-3549.88	-787.65	-616.91	-491.79	-853.79
5. BSFIC	-3243.32 B	-3976.21 R	-6528.88	-3776.32	-78.10	-1960.11	-8616.29	-7220.94	-1205.65	-1791.05	-2367.94	-1249.66	-3148.99	-3360.60
6. BCIC	-6207.04 B	-10149.94 (R)	-23896.97	-12135.04	-7547.67	(2548.76)	(5057.74)	-5537.16	-3425.30	(4547.08)	(3736.52)	(1982.20)	-864.42	(1052.04)

(Figures in the parenthesis indicate profit and -(minus) indicate losses

Note : B = Authorised Budget, R= Revised Budget, All others are Audited Actual, As on - 04/02/1999

Source : MONITORING CELL - MINISTRY OF FINANCE.

Annexe-B

List of the Privatized Enterprises During March 1993-May 1999

(Tk. in lakh)

S	N l a m e	Highest Bid	Long-term Loan	Total Sale value
1.	Kohinoor Chemicals, Dhaka (51% share)	797.00	2,875.00	3672.00
2.	Chittagong Cement clinker (51% Share)	3350.00	1,379.00	4729.00
3.	Eagle Box Cartoon Manufacturing, Dhaka (51% Share)	200.00	-	200.00
4.	Squib (BD) Ltd. Dhaka (40% share)	11.25	-	11.25
5.	Madaripur Textile, Madaripur	807.00	220.78	1027.78
6.	Sharmin Textile, Dhaka	1176.00	1157.97	2333.97
7.	Kishorgonj Textiles, Kishorgonj	953.00	37.47	990.47
8.	Kohinoor Spinning, Dhaka	1,805.00	91.86	1896.86
9.	Zofine Fabrics, Dhaka	125.00	39.86	164.86
10.	Barisal Textiles, Barisal	500.00	161.00	661.00
11.	Bangldesh Cycle Industries, Dhaka	228.46	9.16	237.62
12.	Dhaka Vegetable oil, Dhaka	1393.70	1575.70	2769.40
13.	Royal Textile, Banadarban	25.75	-	25.75
14.	I. K. Industries, Chittagong	70.15	-	70.15
15.	Feroz Ata Dal Mills Ltd., Khulna	0.425	-	425
16.	National Ice Factory, Kishorgonj	11.51	-	11.51
17.	Bangladesh Cold Storage, Munshingonj	125.05	-	125.05

Annexe-C

The Shares of the Following Enterprises are being Sold Through ICB

Sl. No.	Name of the Enterprises (SOEs)	Face value Per Share (Tk.)	Govt. Ownership (%)	Number of shares	Total Face Value (Tk.)	Estimated market price (Taka)
1.	Reckitt & Colman (Bangladesh) ltd.	10/-	10.45	2,33,675	23,36,750/-	4,24,2,033/-
2.	National Tubes ltd.	100/-	52.94	1,32,340	1,32,34,000/-	13,00,14,786/-
3.	Osmania glass Sheet Factory ltd.	100/-	61.72	2,16,020	2,16,02,000/-	19,50,66,060/-
4.	Shampur Sugar Mills ltd.	10/-	96.6	48,30,000	4,83,00,000/-	5,07,15,000/-
5.	Zill Bangla Sugar Mills ltd.	10/-	66	39,60,000	3,96,00,000/-	4,69,65,600/-
6.	Renwice Jagesshar & Company	100/-	60	1,02,000	1,02,00,000/-	73,44,000/-
7.	Atlas Bangladesh Ltd.	10/-	51	6,12,000	61,20,000/-	15,46,70,760/-
8.	Eastern Cables Ltd.	100/-	51	10,20,000	10,20,00,000/-	30,84,58,200/-
9.	Metalex Corporation Ltd.	100/-	51	25,500	25,50,000/-	57,37,500/-

Annexe-D

SOEs for which Letter of Indent (LOI) have been Issued after Final Approval of the Highest Authurity

Sl. No.	Name of the Company	Highest Bid (Tk.)	Long-term Loan (Tk.)	Total Sale value (Tk.)
1.	Hafiz Textile, Chittagong	8,43,27,500/-	4,31,75,295/-	12,75,02,795/-
2.	Ashrafia Oil Mills, Khulna	77,00,000/-	-	77,00,000/-
3.	Bangladesh Cane Company, Chittagong	4,51,00,000/-	1,42,48,000/-	7,93,48,000/-
4.	Cane Making & Tin printing plant, Chittagong	1,60,05,551/-	53,17,700/-	2,13,23,251/-
5.	Dosha Extruction, Chittagong	1,30,00,000/-	-	1,30,00,000/-
6.	B. G. Bangla Rice Mills, Thakurgaon	15,45,930/-	-	15,45,930/-
7.	Desbandhu Sugar Mills, Norshingdhi	1,60,00,000/-	15,34,00,000/-	16,94,00,000/-
8.	Engineering Industries Ltd., Tongi	3,50,00,000/-	24,91,000/-	3,74,91,000/-
9.	Nabarun Jute Mills ltd. Narayangonj	4,41,07,000/-	9,55,11,691/-	13,96,18,691/-

Annexe-E

List of the Enterprises Which are not Possible to be Listed for Sale Due to Cases in the Court

Sl. No.	Name of the Company	Highest Bid (Tk.)	Long-term Loan (Tk.)	Total Sale value (Tk.)
1.	Bangladesh Steel Industries ltd., Tongi	1,05,77,500/-	76,17,713/-	1,81,95,213/-
2.	Leera Industrial Enterprises, Tongi	2,10,51,000/-	All sorts of liability lies to the Company	2,10,51,000/-

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন, ১৪০৮

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা ও অবস্থান – একটি মাঠ পর্যায় অনুশীলন

বেগম রোকসানা মিলি*

The Role and Position of Women Representative in Women Empowerment and Development at the Union Parishad – A Study

Begum Roksana Mili

Abstract : In contemporary development literature, participation of women in development activities from grass roots to central level is getting more priority both nationally and globally for ensuring ender equality. In 1989, after the declaration of CEDAW (Convention for the elimination of All Forms of Discrimination Against Women) the trend of women participation has been more emphasized in all spheres. CEDAW has been formulated for improving the mariginal status of World-wide women by eliminating all kinds of discrimination. The government of Bangladesh has also acted in line with the declaration of CEDAW for ensuring women's representation and participation in the political arena. The Union Parishad election of 1997 may be considered as the outcome of CEDAW which acted an active catalyst in ensuring political participation of women at local government institution and aslo as an important and positive step to gender empowerment in local government body of rural Bangladesh. The Union Parishad is liable to oversee and administer the development projects at local level and the elected women members of UP have given power to implement different projects with other members by involving standing committees at UP level. The manor objectives of this study are to review the range of authority and capacity of elected women exercising in development activities at UP level. The study also examine the

*সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক-প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

responsibilities, identify the constraints of their effective participation in development activities and also asses the opinion of different social classes in relation to their representation Finally, this study suggests economic empowerment, long-term learning and training process, moral education for social security and political socialization should get more priority for effective political participation of women.

ভূমিকা

বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের বৈষম্য দীর্ঘদিনের। সেই শুরু থেকেই সকল প্রকার পশ্চাৎপদতা, অশিক্ষা, শোষণ, বঞ্চনা আর ক্ষমতাহীনতা তাদের কে অধস্তন হয়ে থাকতে শিখিয়েছে। লিঙ্গায়নের বিশেষ সীমারেখায় আবদ্ধতার কারনে এ শৃংখল থেকে তারা কখনই পরিত্রাণ পায়নি। নারীরা এই সমাজে কন্যা-জায়া-জননী হিসেবে পরিচিত হয়েছে সমধিক। নারীর চিরায়ত রূপের ধবজা তুলে সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়ার যাতাকলে বন্দী রেখে তার বহুমুখী প্রতিভাকে সীমিত করে রাখা হয়েছে। আর নিভৃতচারিনী এ নারী জাতি নির্বাকতা বয়ে বেড়িয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এ চিত্র যে শুধু আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের তা নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশ গুলোতে ও নারীরা কম নির্যাতিত ও অবহেলিত হয়নি। একথা সত্যি যে, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোতে নারীর ভূমিকা ও মূল্যায়নের ভিন্নতা আছে, তবে তুলনামূলক বিবেচনায় উন্নয়নশীল দেশের নারী জাতির চিত্র বড়ই করুন বাংলাদেশের সংবিধানে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং ধারায় (১০, ২৭, ২৮ (১), (২), (৩), (৪),, ২৯ (১), (২), এবং ৬৫ (৩)ম নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য বিলোপ এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হলেও বৈষম্য মূলক অবস্থা ও অবস্থানের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি। আর এ কারণেই গত ৩০ বছরেও রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের কোনো শক্তিশালী ভিত গড়ে ওঠেনি। দেশ পরিচালনার শীর্ষ বিন্দুতে নারীর অবস্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন নিয়মতান্ত্রিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবেনা; বহুলাংশে এটিকে আকষ্মিক ঘটনা হিসেবেই আখ্যা দেয়া যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন ও অংশ গ্রহণ ধারণায় নারীর অবদান থাকলেও অভিভাবকতান্ত্রিক (Patrimonial) সাংস্কৃতিক বোধের কারণে যুগ পরম্পরায় সে অবদানের স্বীকৃতি মিলেনি। শুধু তাই নয় উন্নয়নের শরিক সত্ত্বা (Entity) রূপে সমাজ গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক পর্বে নারীর গঠন মূলক ও শক্তিশালী অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় শক্তি ও দক্ষতা যোগানোর বিভিন্ন প্রপঞ্চ (Phenomenon) যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদের অধিকার, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির সহজ ও পর্যাপ্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে যথেষ্ট বৈষম্য ও প্রবঞ্চনার ইতিহাস। শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে পুরুষদের (১৫+) শিক্ষার হার ৫৯.৪% নারী শিক্ষার হার সেখানে ৪২.২% (স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব জরীপ, বি. বি. এস)। পলিসি পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত প্রনয়নের সকল ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সর্বদাই অসম ও অধস্তন মূলক। ইউনিয়ন পরিষদের সর্বমোট ৪,১৯৮ চেয়ারম্যানের মধ্যে মহিলা চেয়ারম্যান মাত্র ২৩ জন। নারীর সম্পদ হীনতা ও সম্পদ প্রাপ্তির আইনগত অধিকারহীনতার কারণে নারীদের এক বিরাট অংশ বিশেষত গ্রামীণ নারীরা চরম ও ব্যাপক দারিদ্রাবস্থায় নিপতিত। ইউ, এন পরিসংখ্যান (১৯৯৫) অনুসারে "In early nineties,women comprised 70% of the world's poor. Data from 41 countries accounting for 81 percent of the total rural population of 114 developing countries indicate that the number of rural women living below the poverty line rose faster than rural men in poverty. Between 965 and 970 women comprised for 57% of the rural poor, by 1988 they accounted for 60 percent of this group (Siddiqi 1996)" বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দরিদ্রতার চরম বঞ্চনার শিকার পুরুষদের তুলনায় নারীরাই বেশি হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বাংলাদেশে দরিদ্রতার যে সুপ্ত ও সুদূর প্রসারী ভয়াবহতার চিত্র অনুধাবিত হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই তা "Feminization'- এ রূপ ধারণ করবে। ধর্ম-বর্ণ-নারী পুরুষ ভেদে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবার সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং নাইরোবী ও বেইজিং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও নারীর সম্পদ প্রাপ্তির আইনগত অধিকারসহ প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল সম্পদ যেমন ভূমি, ঋণ, প্রযুক্তি, তথ্য ইত্যাদিতে অধিকারহীনতার কোন ইতিবাচক সমাধান হয়নি। BIDS (1989) এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, "households facing food

shortages reported a higher proportion of females (71%) compared to males (69%). Higher proption of females (76%) belong to poor householes compared to male counterparts (75.5%). Food consumption of males (per capita) was also found higher not only in aggregate but also in every village under survey" (Siddiqi 1996).

সমাজ ব্যবস্থার একটি মৌলিক অংশ হিসেবে নারী এবং তার ভূমিকাকে কখনোই সমাজ সংগঠনের সামগ্রীক দৃষ্টিকোন থেকে উন্নয়ন সাহিত্যে বিচার করা হয়নি। ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি যখনই এসেছে নারী বিষয়ক চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকেই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের কৌশলরূপে তুলে ধরেছেন। অথচ উন্নয়নের বহুমাত্রিক প্রত্যয় থেকে গোড়াতেই নারীর সামাজিক স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা এবং তা প্রাপ্তির কৌশল গৃহীত হলে দরিদ্র্যতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরন ঘটত- যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সবকটি স্তরে একটি স্বাধীন সত্ত্বা (independent entity) হিসেবে নারী কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সক্ষম হত। সময়ের চাহিদায় অবশ্যই প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে অতি ধীরে হলেও নারী জাগরণে হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং তা জাতীয় সরকারের পরিমন্ডল অতিক্রম করে একবিংশ শতকের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালি অবস্থান করে নিয়েছে। ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণার মাধ্যমে জাতিসংঘ আন্ত র্জাতিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৮৯ সালে ঘোষিত CEDAW (Convention for the Elimination of All Forms of discrimination Against Women) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে তার প্রান্তিক অবস্থান (Marginal position) উত্তরনে একটি আন্তর্জাতিক দলিল রূপে প্রণীত হয়। অতপরঃ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন সমূহ রাজনৈতিক অঙ্গনসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নারী জাগরণ ও অংশগ্রহণের প্রত্যয়কে আরও গতিময়তা দান করেছে। এই সম্মেলন গুলোতে এতদ উদ্দেশ্যে গৃহীত Policy ও Strategy documents, যেমন- Plan of action (Mexico, 1975), The programme of Action (Copenhegen, 1998), Forward Looking Strategy (Nirobi, 1985) এবং Platform For Action

(Beijing, 1995) উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে নারীদেরকে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উত্তরণে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার দ্বার প্রশস্ত করেছে (Chowdhury, 1994)। বেইজিং সম্মেলনের ঘোষণা PFA (Platform For Action) অংশ গ্রহণকারী জাতীয় সরকারগুলো গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার ও PFA গ্রহণ করে তার আলোকে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (NAP) বাস্তবায়ন করছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, ইত্যাদিতে সুষম অধিকার প্রদান, সহিংসতার অপনোদন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারসাম্যাবস্থা আনয়ন ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকার PFA-এর চিহ্নিত ১২টি এরিয়ায় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য কৌশল (Mechanisms) ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে। পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারার এই পটভূমিকায় তৃণমূল পর্যায় থেকে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশক্রমে প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের তিনটি (এক-তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান (GOB 1997) নিঃসন্দেহে নারী উন্নয়ন ও প্রতিনিধিত্বের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় সরকারের একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। এ ধরনের পদক্ষেপ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণ মূলক অবকাঠামো বিনির্মাণের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ এবং জেন্ডার ভিত্তিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করেছে। গবেষণা প্রবন্ধটিতে এ সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে মহিলা প্রতিনিধিত্ব, তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, সেগুলি সম্পাদনে কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা সর্বোপরি প্রবর্তিত এই প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থা মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা স্থানীয় উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কতটা নিশ্চিত করতে পেরেছে প্রবন্ধটিতে সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ক্ষমতায়নের কার্যকর উপায় অনুসন্ধান ও কতিপয় সুপারিশ ও করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি হওয়া সত্বেও রাজনীতির ও প্রশাসনিক বিভিন্ন অবকাঠামোয় নারীদের অংশ গ্রহণ প্রয়োজনের তুলনায় এখনও নিতান্ত নগন্য। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার কাঠামোয়

মহিলাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব প্রদান নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। নারী উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে এই সংযোজন কতটা অর্থবহতা বয়ে এনেছে তা নিরুপণ করাই মূলত গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া, সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে।

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ ;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের অর্পিত ক্ষমতা ও কার্যবলীর পরিসর অনুশীলন এবং তাতে তাদের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ;

(গ) তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন মূলক ও বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমে তাদের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষমতা চিহ্নিত করণ;

(ঘ) নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যা অনুসন্ধান;

(ঙ) মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর মতামত নিরুপণ;

(চ) সর্বোপরি, ক্ষমতায়নের কার্যকর অনুঘটক কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে সরকার, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক ও পলিসি প্রণেতাদের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণা প্রবন্ধটির তাত্ত্বিক ও বাস্তব ভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য জরীপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ফাইল বদ্ধ লিখিত দলিল পত্রাদি, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রাসংগিক প্রতিবেদন, প্রাসংগিক পরিসংখ্যান, বিভিন্ন জার্নাল, বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটিতে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থা কতটুকু অবদান রাখছে বিষয়টি অনুশীলন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত গবেষণা এলাকার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির মতামত জরীপ ছাড়াও কার্য এলাকার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মতামত জরীপ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকাঃ

তথ্য সংগ্রহের জন্য পাংশা থানার অন্যতম বৃহত্তম তিনটি ইউনিয়ন বাবু পাড়া, যশাই ও শরিয়া গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং এলি সম্পাদনে তাদের অংশগ্রহণের বাধা সমূহ চিহ্নিতকরণে ইউনিয়ন তিনটির প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্যানুন্ধান করা হয়। বাবুপাড়া ও যশাই ইউনিয়ন দুটি পাংশা পৌরসভার পাশে অবস্থিত। যশাই ইউনিয়নটি পাংশা সদর থানার ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। অন্যদিকে বাবুপাড়া ইউনিয়নটি পাংশা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পৌরসভার পার্শ্ববর্তী বিধায় উভয় ইউনিয়নে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে।

নমুনা ঃ নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈব নমুনায়ন প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে। তিনটি ইউনিয়নে ৯ জন নির্বচিত মহিলা প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন সামজিক গোষ্ঠি থেকে নমুনা চয়ন করা হয়েছে ।

সারণী-১ঃ গবেষণায় নির্বাচিত নমুনা ইউনিট ও সংখ্যা

ক্রমিক নং	নমুনা ইউনিট	নমুনা আকার (সংখ্যা)
০১	ইউপি মহিলা প্রতিনিধি	৯
০২	স্থানীয় এলিট	২৫
০৩	ইমাম	৭
০৪	শিক্ষিত মহিলা	২৫
০৫	শিক্ষিত পুরুষ	২৫

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ

গবেষণায় নির্বাচিত উত্তর দাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিদের সার্বিক অবস্থা অনুশীলন এবং সামজিক গোষ্ঠির মতামত নিরুপনের জন্য সিডিউল ব্যবহৃত হয়েছে । উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের প্রকৃত চিত্র অনুসন্ধানার্থে সংশ্লিষ্ট গবেষণা এলাকায় একটি জরীপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে । গবেষণার সার্বিক ফলাফল বিশ্লেষণ ও বুঝার সুবিধার্থে সংগৃহীত তথ্য সমূহ শতকরা নিয়মে বিশ্লেষণ করে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঃ কার্যগত ধারণা

উন্নয়ন বহুমাত্রিক প্রত্যয়কে নির্দেশ করে। কখনো উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে, কখনো সমাজ কাঠামোর রূপান্তর ও প্রবৃদ্ধিকে, আবার কখনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মত বহুবিধ উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। Kate young এর মত অনুসারে উন্নয়ন হচ্ছে "Development...............a complex process involving the social, economic, political and cultural betterment of individuals (Duza and Begum, 1995.)

প্রচলিত অর্থে নারী উন্নয়ন বলতে নারীর দারিদ্র বিমোচন, নারীকে আয় উপার্জনে সক্ষম করে তোলা, নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নত করা ইত্যাদিকেই বোঝায়। জেন্ডার প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত হতে নারী উন্নয়ন হলোঃ

দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন;
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উন্নয়ন;
আত্ম নির্ভরশীলতার লক্ষ্যে উন্নয়ন;
একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া স্বরূপ উন্নয়ন;
গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন;
ক্ষমতায়নের জন্য উন্নয়ন'
জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য উন্নয়ন (রহমান, ১৯৯৭)।

ক্ষমতায়ন ঃ

১৯৮৫ সালের নাইরোবীর বিশ্ব নারী সম্মেলনের পূর্বে কতিপয় উদ্যোগী মহিলা ও সংগঠন DAWN's (Development Alternatives with women for

a New Era) এর গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রথম বারের মত একটি 'কনসেপ্ট' বা 'এপ্রোচ' রূপে সংজ্ঞায়িত করেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য কেবল বিশ্ব নারী সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণ-ই ছিলনা বরং ভবিষ্যৎ বিকল্প সমাজ গঠনের দর্শন নির্ধারণ করা ও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী ও জেন্ডার ভিত্তিক অসমতা নির্মূল সাপেক্ষে বিশ্বময় একটি সুষম ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস গৃহীত হয়। এই নতুন-সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের দর্শন অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যুকে আরো তাৎপর্যবহ এবং প্রয়োজনীয় করে তোলে।

ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক ধারণা ও প্রক্রিয়া বিশেষ। ৮০' এর দশকের জনপ্রিয় এই পরিভাষাটি দ্বারা নারীর বঞ্চিত শোষিত, অবহেলিত ও অধস্তন মূলক অবস্থা ও অবস্থান হতে ক্রমান্বয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন প্রপঞ্চগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার অর্জনের প্রক্রিয়া বুঝায়। নারীর স্ব স্ব কর্ম পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফলপ্রসু অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেও ক্ষমতায়ন বলা যায়। Griffen (1989) ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণা দিয়েছেন- Women's empowerment has been described as'adding to women's power' with power meaning being able to make contributions at all levels os society and having this contribution recognized and valued. Power in the context of women therefore, means participating in decision-making in all spheres of life not just areas of society which are accepted as women's place, creating from a women's perspective, and being recognized and respected as equal citizens and human beings capable of effectively contributing to society".

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া মূলত প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার প্রয়োজন ও মান নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা মেটাতে (Physical quality of life indicators) পর্যাপ্ত সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থেকে শুরু করে সমাজ ও রাজনীতিকে (Society and polity) সিদ্ধান্ত প্রণয়ন দ্বারা প্রভাবিত করণের ক্ষমতা পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ ক্ষমতায়নের ধারণাকে একটি সামগ্রীক ও অখণ্ড (Holistic approach) দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করা

প্রয়োজন যেখানে পর্যায়ক্রমে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। Friedmann (1992) এ ধরনের ক্ষমতায়নের কথাই বলছেন। তাঁর মতে, "Puts it these three kinds (social, psychological and political) of empowerment can be thought of as forming an interconnected triad centered round an individual women and her household. An interlinking of these triads creates a social network of empowering relations which because of its reinforcing qualities has great potential for bringing about social change" মূলতঃ নারীর অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও দক্ষতা বিকশিত করা এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে তার স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া-ই ক্ষমতায়ন। আর এ জন্য একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন ঘটানো প্রয়োজন। Friedmann (১৯৯২) এই তিন ধরনের ক্ষমতায়নকে একটি আন্তঃসম্পর্কিত ত্রয়কাঠামোতে (triad centred) বিন্যস্ত করেছেন যা ব্যক্তিক নারী এবং তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঘিরে আবর্তিত হয় এবং এই আন্তঃসংযুক্ত আবর্তন ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে এবং তা সামাজিক পরিবর্তন সংগঠনে অপরিমেয় অবদান রাখে। ইউ.পি পর্যায়ে মহিলা সদস্যাদের অংশ গ্রহণ ও সমস্যা ক্ষমতায়নের আলোচ্য ধারণার আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কেননা ক্ষমতায়ন যেহেতু একটি প্রক্রিয়া বিশেষ, তা-ই সমগ্র প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক মাত্রা (Dimension) থেকেই এর বাস্তবায়ন উদ্যোগ প্রয়োজন। ইউ. পি পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটানোর শুরুতেই তাই সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর (Bases of social power) বিভিন্ন প্রপঞ্চ গুলিতে যেমন তথ্য প্রাপ্তি, শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি সহ সামাজিক সংগঠন ও উৎপাদনশীল সম্পদে নারীর সুষম অধিকার নিশ্চিত প্রয়োজন। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন নারীর আত্মবিশ্বাসে যে সমৃদ্ধি ও স্থিরতা দিবে পরবর্তিতে তাই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে শুধু নিজের জন্যই নয়, নারী সমগ্র সমাজের শোষণ, দরিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা ও অবিচারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবদান রাখতে পারবে। এ প্রসঙ্গে (Huq 1995) এর ধারণা প্রণিধানযোগ্য-''Endows people to ask why' how what and also with the capability to challenge subordination and exploitation not only for her own self but also for others who are

unable to struggle against hunger, poverty illiteracy and social injustice"

ইউনিয়ন পরিষদ ও নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোয় সর্বনিম্ন তৃণমূল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ । এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তনের গোড়া থেকেই জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক কাঠামোর নেতৃত্ব দিয়ে আসলেও নারীর অংশগ্রহণের ও প্রতিনিধিত্বের সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়নি । উপনিবেশকালে বৃটিশ শাসকগণ মূলত তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। ১৮৭০ সালে বৃটিশ শাসকগণ 'চৌকিদারী পঞ্চায়েত' নামে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান চালু করেছিল, তা-ই বৃটিশ পিরিয়ড থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন নাম যেমন, ত্রি-স্তরীয় ইউনিয়ন কমিটি (১৯৫৮), দ্বি-স্তরীয় ইউনিয়ন বোর্ড (১৯১৯), চার স্তরীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল (১৯৫৯) ইত্যাদি ধারণ করে বাংলাদেশ পিরিয়ড পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে। গোড়া থেকেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পুরুষ প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব একচ্ছত্র ভাবে বজায় ছিল। নারীরা এ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার বা প্রতিনিধি হওয়ার বিষয়টি নিজেরা কখনও চিন্তা করেনি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে সরকার স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে ত্রি-স্তর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সূচনা করেন। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলে ২ জন মহিলা সদস্য নির্বাচনে বিধান করা হয় (Ahmed and others 2000)। এর প্রায় দু'দশক পর ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি (এক-তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনে বিধান সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ ও ক্ষমতায়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ঐ নির্বাচনে সকল পদে প্রতিদ্বন্দ্বী নারীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৪৬,০০০ এবং এর মধ্যে ১২,৮২৮ সংরক্ষিত আসনে, ১১০ জন সাধারণ আসনে এবং ২০ জন চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। নিম্নে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণের একটি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত হলো ।

সারণী ঃ ২ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নারীর অবস্থান ঃ

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা	মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান এর সংখ্যা
১৯৭৩	৪৩৫০		-	১
১৯৭৭	৪৩৫২		৭	৪
১৯৮৪	৪৪০০		৬	৪+২=৬
১৯৮৮	৪৪০১	১৮৫৬৬	৭৯ (.৪%)	১
১৯৯২-৯৩	৪৪৪৩	১৭৪৪৪	১১৫ (.৬%)	১৩+১১=২৪
১৯৯৭-৯৯	৪৪৭৯		৪৬.০০০	২০+৩=২৩

সূত্র ঃ ডঃ সৈয়দ রওশন কাদির এর প্রবন্ধ নারী উন্নয়ন প্রসঙ্গিক পরিসংখ্যান, Safi Ahmed and et.al এর প্রবন্ধ One Decaded of Bangladesh Under Women Leadership এবং দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মে , ১৯৯৮ থেকে উদ্ধৃত।

স্থানীয় সরকারের রাজনৈতিক কাঠামোয় মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার কিয়দংশ বর্তমান ব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে বলা যায় । উপরের চিত্র তারই সাক্ষ্য বহন করছে । কিন্তু স্থানীয় সরকার উন্নয়নে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও কার্যকর অংশগ্রহণে তাদের অবস্থান কতটুকু এ ব্যবস্থায় সম্ভব হচ্ছে, বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ এবং বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

উত্তরদাতাদের (মহিলা প্রতিনিধি) আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ ঃ

সারণী-৩ ঃ মহিলা প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অষ্টম শ্রেণী পাশ	৬	৬৬.৬
নবম শ্রেণী পাশ	২	২২.২
এস এস সি পাশ	১	১১.১
এইচ এস সি পাশ	০	০
মোট	৯	১০০

মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশী সংখ্যক মহিলাই (৬৬.৬%) ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন। মাত্র ১ জন (১১.১%) এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন এবং বাকী দুজন (২২.২%) নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। এই তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে, তিনটি ইউনিয়নের কোনটিতেই উচ্চ শিক্ষিত মহিলারা প্রতিনিধিত্বে আসেন নি।

সারণী-৪ ঃ বৈবাহিক অবস্থার বিবরণ ঃ

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিবাহিত	৭	৭৭.৭ প্রায়
অবিবাহিত	১	১১.১
তালাক প্রাপ্তা	১	১১.১
মোট	৯	১০০

টেবিল ৪ এ প্রতিনিধিদের বৈবাহিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে বেশী সংখ্যকই অর্থাৎ ৭ জন (৭৭.৭%) বিবাহিত এবং পারিবারিক জীবনযাত্রায় নিয়োজিত। অবশিষ্ট ২ জনের মধ্যে ১ জন (১১.১%) অবিবাহিত এবং অন্যজন (১১.১%) তালাক প্রাপ্তা।

সারণী-৫ ঃ মহিলা প্রতিনিধিদের স্বামীর পেশা, মাসিক আয় এবং যোগ্যতার বিবরণ ঃ

পেশার বিবরণ	মাসিক আয় (টাকায়)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষিকাজ	১০০০-২০০০	৩	৩৭.৫
ব্যবসা	৩০০০-৪০০০	৪	৫০
চাকুরী	১৬৫০	১	১২.৫
মোট		৮	১০০

৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৩ জনের স্বামী কৃষিকাজ, ৪ জনের স্বামী ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট একজনের স্বামী চাকুরীজীবী। টেবিলে উল্লেখিত মাসিক আয় ছাড়া তাদের স্বামীদের যে সম্পত্তি আছে তা দ্বারা দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা নির্বাহ করাই দুস্কর। উত্তরদাতা ইউপি সদস্যদের তাদের সকলের মাসিক আয়ের গড় হচ্ছে ২,৫০০/=। পিতা এবং স্বামীর শিক্ষাস্তর অনুশীলনে দেখা যায় সদস্যদের কেহই শিক্ষিত পরিবার থেকে আসেন নি এবং বিবাহও হয়নি। তাদের মধ্যে ৫ জনের পিতা কৃষিজীবী এবং অন্য ৩ জনের পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর এস এস সি পাশ হলেও তারা কোন চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন না। অবশিষ্ট ১ জনের পিতার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া আছে। অন্যদিকে, ৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৬ জনের স্বামী ৯ম শ্রেণী পাশ এবং অন্য দুজনের স্বামী কেবল এস. এস. সি পাশ। শিক্ষাগত যোগ্যতার এই স্তর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইউ পি মহিলা সদস্যরা সমাজের কোনো উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠি থেকে আসেন নি। সকলেই নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং বলা যায় প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পটভূমি তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি।

সারণী-৬ ঃ ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের বয়স ঃ

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২০-৩০	৪	৪৪.৪
৩০-৪০	৪	৪৪.৪
৪০+	১	১১.১
মোট	৯	১০০
বয়সের গড় ৩০		

তিনটি ইউনিয়নের মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তাদের গড় বয়স ৩০ বছর। মাত্র ১ জন পঁয়ত্রিশোর্ধ আছেন।

৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৩ জনের স্বামী কৃষিকাজ, ৪ জনের স্বামী ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট একজনের স্বামী চাকুরীজীবী। টেবিলে উল্লেখিত মাসিক আয় ছাড়া তাদের স্বামীদের যে সম্পত্তি আছে তা দ্বারা দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা নির্বাহ করাই দুস্কর। উত্তরদাতা ইউপি সদস্যদের তাদের সকলের মাসিক আয়ের গড় হচ্ছে ২,৫০০/=। পিতা এবং স্বামীর শিক্ষাস্তর অনুশীলনে দেখা যায় সদস্যদের কেহই শিক্ষিত পরিবার থেকে আসেন নি এবং বিবাহও হয়নি। তাদের মধ্যে ৫ জনের পিতা কৃষিজীবী এবং অন্য ৩ জনের পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর এস এস সি পাশ হলেও তারা কোন চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন না। অবশিষ্ট ১ জনের পিতার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া আছে। অন্যদিকে, ৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৬ জনের স্বামী ৯ম শ্রেণী পাশ এবং অন্য দুজনের স্বামী কেবল এস. এস. সি পাশ। শিক্ষাগত যোগ্যতার এই স্তর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইউ পি মহিলা সদস্যরা সমাজের কোনো উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠি থেকে আসেন নি। সকলেই নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং বলা যায় প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পটভূমি তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি।

সারণী-৬ ঃ ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের বয়স ঃ

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২০-৩০	৪	৪৪.৪
৩০-৪০	৪	৪৪.৪
৪০+	১	১১.১
মোট	৯	১০০
বয়সের গড় ৩০		

তিনটি ইউনিয়নের মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তাদের গড় বয়স ৩০ বছর। মাত্র ১ জন পঁয়ত্রিশোর্ধ আছেন।

সারণী-৭ ঃ মহিলা প্রতিনিধিদের পরিবারের ধরন ও আকার-

পরিবারের ধরন		(মোট সংখ্যা-৯)
	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
একক পরিবার	৭	৭৭.৭
যৌথ পরিবার	২	২২.২
মোট	৯	১০০
পরিবারের আকার		
সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৩	১	১১.১
৪	২	২২.২
৫	২	২২.২
৬	২	২.২২
৯	২	২.২২
মোট	৯	১০০

পরিবারের ধরন ও আকার অনুসন্ধানে গ্রামীণ পরিবারের চিত্র অনেকাংশেই প্রতিভাত হয়েছে। যারা একক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (৭৭.৭%) তারা প্রথমাবস্থায় যৌথ পরিবারেই ছিলেন এবং অতপর নানাবিধ দ্বন্দ্ব সংঘাতকে কেন্দ্র করেই একক পরিবার গঠনে বাধ্য হয়েছে।

সারণী-৮ ঃ প্রতিনিধিদের বাসস্থানের প্রকৃতি

বাসস্থানের ধরন	সংখ্যা	শতকার হার (%)
টিনের ছাদ ও চাটার বেড়া	১	১১.১
বাঁশের বেড়া ও ছনের ছাদ	৩	৩৩.৩
টিনের ছাদ ও টিনের বেড়া	১	২২.২
আধাপাকা	১	১১.১
মোট	৯	১০০

মহিলা প্রতিনিধিদের বেশী সংখ্যক (৪৪.৪%) এর বাড়ি টিনের তৈরি। সর্বাধিক কম সংখ্যা (১১.১%) এর আধাপাকা বাড়ি রয়েছে। অধিকাংশের বাড়িতে বসবাসের জন্য একটি মাত্র ঘর ও একটি রান্না ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি আঙ্গিনা নিয়ে তাদের বাড়ির সীমানা বিস্তৃত। আসবাবপত্র বলতে একটি টেবিল, দুইটি চেয়ার, ঘরের দুই কোণে দুইটি বড় চৌকি, একটি বাঁশের মাচা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই।

নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে সরকার তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য দেয়নি। ১৯৯৮ সালের ৫ই নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্বলিত এক পরিপত্র প্রেরণ করে। পরিপত্রে বলা হয়, গ্রামীণ মহিলাদের সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণ এবং সরকারি উন্নয়মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ. ১৯৮৩ এর আওতায় সরকার সকল ইউনিয়ন পরিষদের যে তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সেই তিনটিকে একটি ইউনিয়ন ধরে পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একটি করে "সামাজিক উন্নয়ন কমিটি" নামে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট তিন ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত মহিলা সদস্য পদাধিকার বলে " সামাজিক উন্নয়ন কমিটির" সভাপতি হবেন এবং তাতে ৮ জন সদস্য থাকবে। ওয়ার্ডে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন এবং ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্য হতে সভাপতি কর্তৃক সদস্য নিযুক্ত হবেন। সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে যে সকল মহিলাদের সমাজ উন্নয়নে আগ্রহ / অবদান রয়েছে তাহাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কমিটি গঠিত হবার পর সভাপতি উহার তালিকা থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সকলকে অবহিত করবেন। সামাজিক উন্নয়ন কমিটি পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হবে । তবে এর সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য থাকাকালীন মেয়াদেই নিযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। সামাজিক উন্নয়ন

কমিটি সুবিধা মতো কোনো বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা সুবিধা জনক অন্য কোন স্থানে প্রতি মাসে ন্যূনতম একবার মিলিত হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।

সামাজিক উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলী ঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য সহযোগীতা করা। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা ও পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার ব্যাপারে এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২. স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানি পানে এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা,

৩. প্রতি গ্রামে বিশুদ্ধ পানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য পুকুর চিহ্নিত করা এবং নির্দিষ্ট পুকুরের ব্যবস্থাপনা করা,

৪. জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যাদি প্রেরণ করা,

৫. প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে সরকারি কার্যক্রম বাস্ত-বায়নে সহযোগীতা করা,

৬. প্রাথমিক স্কুলগামী শিশুদের স্কুলে প্রেরণের জন্য এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা,

৭. আর্থিক স্বনির্ভর আনয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে উদ্বুদ্ধ করা,

৮. এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে হাঁস মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, সমবায় সমিতি গঠন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা এবং সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেতনতা করা,

৯. নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দ্যেশে এলাকাবাসীদের সচেতন করা,

১০. এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দ্যেশ্য বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষ-নিষ্পত্তি করা,

১১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান,

১২. সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

অতিরিক্ত ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম আরো গতিশীল এবং মহিলা সদস্যগণকে পরিষদের কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউ পি) অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এর ৩৮ (১) সংশোধিত ধারায় ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো হলোঃ

১) নারী ও শিশু কল্যাণ,

২) মৎস ও শিশু সম্পদ।

৩) বৃক্ষ রোপণ।

৪) ইউনিয়ন পূর্ত কর্মসূচি এবং

৫) সার্বিক স্বাক্ষরতা (গণ শিক্ষা)।

উল্লেখ্য যে, ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন এবং পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে একটি কমিটির সভাপতি করার বিধান করা হয়েছে। ফলে মহিলারা প্রথমবারের মত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া "থানা উন্নয়ন সহায়তা" খাতের অর্থব্যয়ে ২৫,০০০ টাকা মূল্যমানের ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মহিলা সদস্যদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মহিলাদের আরো কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করা হয়েছে ঃ

নলকূপের স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ নলকূপের স্থান নির্ধারণ কমিটির সদস্য। তার ওয়ার্ডে কোথায় নলকূপ স্থাপন করতে হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ ও মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিতে মহিলা সদস্যগণ সভাপতি এবং এর মনিটরিং কার্যক্রমে তিনজন মনিটরের মধ্যে একজন মহিলা সদস্য মনিটর হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

ইউপি পর্যায়ে বয়স্কভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিটি ওয়ার্ডে মহিলা সদস্যকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করেছে। মহিলা সদস্যরা তার নিজের এলাকায় যে বয়স্ক ভাতা পাবার যোগ্য তা নির্ধারণ করবেন এবং সে অনুযায়ী নিজ দায়িত্বে বয়স্ক ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

ভিজিএফ ও ভিজিডি সংক্রান্ত কাজঃ

ভিজিএফ ও ভিজিডি কর্মসূচিতে গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা তাদের এলাকায় কার্ড পাওয়ার যোগ্য দুঃস্থ মহিলাদের নির্বাচন করবেন এবং সে অনুপাতে কার্ড বিতরণ করবেন।

এ সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলী ছাড়াও সরকার মহিলা প্রতিনিধিদের আরো কিছু কার্যাবলী প্রদানের পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই করেছেন। সেগুলি হলোঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত কাজঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত বিদ্যমান বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটির এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত মহিলা সদস্যকে সভাপতি করার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রাণালয়ের আওতাধীন গৃহীত প্রকল্প কমিটির এক-তৃতীয়াংশ কমিটির ক্ষেত্রে ইউপি মহিলা সদস্যকে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করার বিষয় ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও সচেতনতা বিষয়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ ঃ

গ্রামীণ মহিলাদের সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণ এবং সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর আওতায় মহিলা প্রতিনিধিদের যে ক্ষমতা ও কার্যাবলী দেয়া হয়েছে নমুনায়িত এলাকার অধিকাংশ (৫০%) প্রতিনিধি তাদের উপর অর্পিত সে সকল ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবহিত নন। প্রতিনিধিদের নিকট তাদের দায়িত্ব পালন ও কর্তৃত্বের পরিসর জানতে চাওয়া হলে প্রথমত তারা স্বামীদের দেখিয়ে দিয়ে গৃহের বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততা দেখায় অর্থাৎ অধিকাংশের স্বামীরাই বিভিন্ন মিটিং ও কাজ কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। গবেষণায় নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামত জরিপ করে নিম্ন লিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

সারণী -৯ ঃ প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে মহিলা প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
প্রকল্প	প্রকল্পের সংখ্যা	মহিলা প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ	শতকরা হার (%)
খাল পুনখনন	৬	নাই	০
ড্রেন নির্মাণ	২ কি.মি	১ কি.মি	৫০.০
রাস্তা নির্মাণ	৮	৬টি	১৫.৭
বঙ্গ বন্ধু কলেজ নির্মাণ	১ টি	নাই	০
রাস্তা মেরামত	৬	২টি	৩৩.৩৩
নলকুপ	৪০টি	৫টি	১৩.৮
পুকুর সংস্কার	৪টি	নাই	০
বৃক্ষ রোপণ	২	নাই	০
আশ্রয়ন	৬টি	২টি	৩৩.৩
কালভার্ট	৩০টি	৫টি	১৬.৬
এডিবি এর প্রকল্প	৫টি	১টি	২০
কাবিখা	৫টি	২টি	৪০
মোট	২০০টি	৩৫টি	১৭.৫

একটি ইউনিয়নে প্রতি অর্থ বছরে ন্যূনতম ৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার বিধান রয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পে ২০,০০০/- টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। এই সব প্রকল্পের এক তৃতীয়াংশ কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিগণ সভাপতি এবং একইসাথে মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবেন বলা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যে মহিলাদের সম্পুর্ণ অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি । চেয়ারম্যান স্বয়ং এসকল বিষয়ে ক্ষমতা ও কতৃত্ব ভোগ করে থাকেন । অবশ্য ৯ জন প্রতিনিধি মধ্যে ৪ জন জানান যে, তারা মোট ৬ টি প্রকল্পের কাজ হাতে পেয়েছিলেন, সে গুলির মনিটরিং এর দায়িত্ব ও তাদের উপর ন্যস্ত ছিল । এ সব প্রকল্পে তাদের ১০০০/- টাকা করে পারিতোষিক ছিল ।

উপরের সারণীতে আরো দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পকাজে ইউপি প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ আশানুরূপ হয়নি । রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে তাদের অংশ গ্রহণ মাত্র ১৫% নম্ভব হয়েছে , অন্যদিকে মেরামত প্রকল্পে তাদের অংশ গ্রহণ আরো কম অর্থাৎ ১৩.৮%। খাল পুনঃখনন ও বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে তাদের কোন অংশ গ্রহণ নেই । সারণীতে উল্লেখিত সকল প্রকল্পের মধ্যে আশ্রয়ন ও কাবিখা প্রকল্পে তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো অর্থাৎ ৩৩.৩ % এবং ৪০% যথাক্রমে । এগুলি বাদ দিলে অন্যান্য প্রকল্পে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণই সম্ভব হয়নি। ইউপি পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এ ধরনের স্বল্প অংশগ্রহণ মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ইতিবাচক ইংগিত বহন করে না ।

সারণী-১০ ঃ নলকূপের সংখ্যা ও তার স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
সুপারিশকারী - দের সংখ্যা	নলকূপের সুপারিশকৃত স্থান ও সংখ্যা	গৃহীত সুপারিশের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২	১০	০	০
২	১৮	৪	২২.২০
১	৮	৩	৩৭.৫০
১	৮	৪	৫০.০
২	৯	৬	৬৬.৬
১	৪	৩	৭৫.০
৯	৫৮	২০	৩৪.৫%

নলকূপের স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটিতে নারী প্রতিনিধিদের কাগুজে ক্ষমতা দেয়া হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এ কাজে তাদের সন্তোষজনক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। ২ (দুই) জন প্রতিনিধি বলেন, "আমার নিজ বাড়িতেই টিউবওয়েল নাই, সেক্ষেত্রে অন্য কোথাও টিউবওয়েলের স্থান নির্ধারণের সুপারিশ করার পর চেয়ারম্যান কতটুকু গ্রহণ করবেন তা বলাই বাহুল্য। চেয়ারম্যান আমাদের কোন সুপারিশই মূল্যায়ন করেন না। তার ইচ্ছেমতো রাজনৈতিক আনুকূল্য প্রাপ্তির জন্য সমর্থন ভিত্তি (Support base) শক্তিশালী করণে টিউবওয়েগুলো বিতরণ করে থাকেন।" অন্য ২ (দুই) জন প্রতিনিধি বলেন, "আমার নির্বাচনী এলাকা ৯টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। প্রতিটি গ্রামে একটি করে হলেও অন্তত ৯টি টিউবওয়েলের প্রয়োজন এবং ৯টি টিউবওয়েল-এর সুপারিশ চেয়ারম্যানের নিকট করেছিলাম। এর মধ্যে মাত্র ২টির সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। সারণীতে দেখা যায় তিনটি ইউনিয়নের মহিলা প্রতিনিধিদের নলকূপের স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত এবং নলকূপ স্থাপনের মোট ৫৮টি সুপারিশের মধ্যে ২০টি (২৬.২০%) সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। সমাজ সেবা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের এ ধরনের প্রান্তিক অংশগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়নে নেতিবাচক পরিস্থিতির স্বাক্ষ্য বহন করছে।

সারণী -১১ ঃ বয়স্ক ভাতা প্রদান সংক্রান্ত সুপারিশ ঃ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
সুপারিশকারী সদস্যদের সংখ্যা	সুপারিশকৃত কার্ডের সংখ্যা	গৃহীত সুপারিশের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২	২৭	১০	৩৭.০৩
১	৮	৪	৫০
১	১০	০	০
২	১৫	৮	৫৩.৩০
২	২০	১২	৬০
১	৯	৮	৮৮.৮
৯	৮৯	৪২	৪৭.১৯

মহিলা সদস্যগণ স্ব স্ব এলাকায় বয়স্ক ভাতা বিতরণ কার্যের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তারা এ কমিটির সদস্য থাকবেন বলে উল্লেখ রয়েছে এবং

বয়স্ক ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রহীতাদের তালিকা তৈরীর কর্তৃত্ব তারা ভোগ করবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। সারণী ১১ হতে দেখা যাচ্ছে ২ জন প্রতিনিধির সুপারিশকৃত ২৭টি কার্ডের মাত্র ১০টি গ্রহণ করা হয়েছে। ৩ জন প্রতিনিধির সুপারিশকৃত ২২টি কার্ডের একটিও চেয়ারম্যান গ্রহণ করেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর জাল করে নিজেই ইস্যু করছেন বলে মহিলা সদস্যগণ উল্লেখ করেন। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ৯ জন সদস্যের ৮৯টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র ৪২টির (৪৭.১৯%) সুপারিশ চেয়ারম্যান গ্রহণ করেছেন।

সারণী -১২ ঃ ভিজিডি কার্ডের তালিকা প্রণয়নে মহিলা ইউপি সদস্যাদের অংশ গ্রহণ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
কার্ড প্রণয়নকারী	কোটাভিত্তিক কার্ডের সংখ্যা	তালিকা প্রস্তুতের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১	১৮	৮	০
১	১৭	৬	২২.২০
১	১৭	৪	৩৭.৫০
২	৪৪	১৮	৫০
১	২২	৭	২৯
২	৬০	২১	৩৩.৩৩
১	৩৬	১২	৩৩.৩৩
মোট	২১৪	৭৫	৩৫.০৫%

উপরের সারণীতে ভিজিডি কার্ডের তালিকা প্রণয়নে অনিয়মের চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টেবিলে দৃশ্যমান মোট ১৬৮টি কার্ডের মধ্যে ৫২টি বাবু পাড়া ইউনিয়নে, ৬৬টি যশাই ইউনিয়নে এবং ৯৬টি শরিষা ইউনিয়নে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের আওতায় দেয়া হয়। অর্থাৎ বাবু পাড়া ইউনিয়নের

১০৪টি, যশাই ইউনিয়নের ১৩২টি এবং শরিষা ইউনিয়নে ১৯২টি ভিজিডি কার্ডের ৫০ শতাংশের অর্থাৎ ২১৪টি কার্ডের তালিকা তৈরির দায়িত্ব মহিলা সদস্যদের ছিল অথচ চেয়ারম্যানের চরম আধিপত্যবাদী মনোভাবের কারণে উক্ত ৯জন প্রতিনিধি মোট ২১৪টি কার্ডের মধ্যে মাত্র ৭৫টি কার্ডের তালিকা তৈরি করতে পেরেছেন। অর্থাৎ ২১৪টি কার্ডের মধ্যে মাত্র ৩৫.০৫ শতাংশ কার্ডের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। ভিজিডি কর্মসূচির কার্ডের তালিকা প্রণয়নে বাবুপাড়া, যশাই ও শরিষা ইউনিয়ন ৩টিতে চরম অনিয়ম চলছে। ইউনিয়নের ৫০ শতাংশ ভিজিডি কার্ডের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব মহিলা সদস্যদের থাকলেও চেয়ারম্যান মতামত উপেক্ষা করে নিজস্ব পছন্দ মাফিক তালিকা প্রণয়ন করে থাকেন। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ ও চেয়ারম্যানের নির্দেশানুসারে পুরুষ সদস্যগণ তৈরি করেন। ফলে ঃ মহিলারা কার্ডের তালিকা প্রণয়নে তাদের কোটার সদব্যবহার করতে পারছেন না।

ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণঃ

বাবুপাড়া ও শরিষা ইউনিয়নে তেমন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় সে সময় পর্যন্ত ঘটেনি। যশাই ইউনিয়ন নদীর তীরে অবস্থিত বিধায় প্রতিবার বন্যার কবলে পতিত হয়। ইউনিয়নটির মহিলা প্রতিনিধিগণ ক্ষতিগ্রস্জনগনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য যে সকল সুপারিশ করেছেন তা গৃহীত হয়নি। মুলতঃ এ সব কর্মসুচিতে চেয়ারম্যান ও পুরুষ প্রতিনিধিদের ছিল চরম একাধিপত্য। দুর্যোগমুহূতে মহিলা প্রতিনিধিগণ জনগণের জন্য যদি সহযোগিতা মূলক পদক্ষেপ না নিতে পারেন তবে জনসাধারণ চাইবেনা যে তারা পুনরায় নেতৃত্বে আসুক। মহিলা প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিকুল অবস্থা তাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সুফল বয়ে আনবেনা ।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচি ঃ (কাবিখা)

ইউনিয়ন গুলোতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচিতে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পুরুষ সদস্যরাই পালন করে থাকেন ।

গ্রামীণ বিবাদ মিটানো ঃ

গ্রামীণ বিবাদ বিসম্বাদ ও আপোস নিস্পত্তিতে মহিলা প্রতিনিদের ডাকা হয়না । গ্রামীণ পরিবেশে এ ধরনের কাজে জনগণ এখনও তাদের প্রয়োজন অনুভব করেন না । এখনও গ্রামে মোড়ল মাতব্বর শ্রেণীই বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করে থাকেন ।

সামজিক উন্নয়ন মূলককার্যক্রম ঃ

মহিলা প্রতিনিধিগণ জনগণের মাঝে স্যানেটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, ছেলেমেয়েদের স্কুলে দেয়ার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহ প্রদান, কৃষি খামার, বৃক্ষ রোপণ, পরিবারের লোক সংখ্যা সীমিত করন ইত্যাদি ব্যাপারে সামর্থ্য মত পরামর্শ দিয়ে থাকেন বলে উল্লেখ করেছেন ।

সারণী-১৩ ঃ মহিলা প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার কার্যকারীতা সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মতামত

সংখ্যা ৮২			(শতকরায় %)
সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগন	উত্তরদাতার সংখ্যা	মতামত	
		কার্যকর (effective)	কার্যকর নয় (not effective)
স্থানীয় এলিট	২৫	৮ (৩২)	১৭ (৬৮)
মসজিদের ইমাম	৭	৭ (১০০)	নাই (০)
শিক্ষিত মহিলা	২৫	৫ (২০)	২০ (৮০)
শিক্ষিত পুরুষ	২৫	১৪ (৫৬)	১১ (৪৪)
মোট	৮২	৩৪ (৪১.৪৬)	৪৮ (৫৮.৫৬)

টেবিলে দৃশ্যমান যে, বাবুপাড়া , যশাই এবং শরিষা ইউনিয়নের স্থানীয় এলিট শ্রেণীর ২৫ জনের মধ্যে মাত্র ৮ জন অর্থ্যাৎ ৩২% মহিলা প্রতিনিধিদের ভূমিকা কে ফলপ্রসূ বলে আখ্যায়িত করেছেন । এদের মধ্যে

কেউ কেউ বলেছেন , সরকারের এ পদক্ষেপ ভাল-ই । কারণ এর ফলে কিছু সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র মহিলার প্রতিনিধিত্বে আসার সুযোগ হওয়ায় তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় । কিন্তু তাদের দারা এলাকার মানুষের উন্নতির ইতিবাচক দিক সম্পর্কে মন্তব্য করেননি । কয়েকজন প্রবীণ এলিট বলেন, মেয়েদের আবার মেম্বার হওয়ার দরকার কি ? তাদের স্থলে আরো তিনজন পুরুষ সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলে সবাই সমশক্তিতে একযোগে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারতো" । মসজিদের ৭ জন ইমামের মধ্যে সকলেই তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ইতিবাচক মত দিয়েছেন । তাদের মতে ' সাংসারিক কাজকর্ম গুছিয়ে নারীরা যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে তাতে কোন বাধা থাকা উচিৎ না । তবে তা অবশ্যই তার স্বামীর সম্মতি ব্যতিত এবং পর্দা ও শালিনতার বরখেলাফ করে নয় । শিক্ষিত মহিলাদের মাত্র ২০% নারী প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ কার্যকর বলে মত প্রকাশ করেন এবং ৮০% উত্তরদাতাই এ ধরনের গুরুত্বহীন নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে । কেউ কেউ বলেন সরকার নারীর ক্ষমতায়নে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ভাল। তবে যতদিন না অন্যান্য স্থানীয় সরকার কাঠামোয় ও জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সন্তোষজনক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যাবে,ততদিন নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি তাত্ত্বিক ধারণাই থেকে যাবে । শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে ৫৬% মহিলা প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার কথা বলেন। অবশিষ্ট ৪৪% উত্তরদাতা, যারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৪ জন (৯.০৯%) মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপকে জেনারেল আইয়ুব খানের ১৯৫৬ সালের Basic Democracy এর সাথে তুলনা করে বলেন, সরকার তার রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি আরো শক্তিশালী করার জন্যই এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর সাথে নারীর ক্ষমতায়নের এই পদক্ষেপের তুলনা যুক্তি সংগত নয়। কারণ Basic Democracy তে মৌলিক গণতন্ত্রীদের অবস্থান কে শক্তিশালী করা হয়েছিল । অথচ ইউপি পর্যায়ে মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য বর্ণিত বিভিন্ন প্রশাসনিক উন্নয়নমূলক কর্তৃত্ব ও কর্মকাণ্ডে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণের সুযোগ বিভিন্ন ভাবে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে । তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না । এ সকল

কিছুর জন্য তারা চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের স্বেচ্ছাচারীতাকে সব চেয়ে বেশী দায়ী বলে মনে করেন ।

মহিলা প্রতিনিধির ভূমিকা মূল্যায়নঃ

মহিলা প্রতিনিধিদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এবং মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় সরকার কাঠামোয় মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নারীর ক্ষমতায়নে যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবার কথা ছিল তা অনেকাংশেই সম্ভব হয়নি। প্রকল্প সংক্রান্ত কার্য, বয়স্কভাতা প্রদান, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, ভিজিডি কার্ড বিতরণ, নলকুপের স্থান নির্ধারণ, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মহিলা প্রতিনিধিরা বরাবরই উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিষদ থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে মহিলা সদস্যদের অংশ গ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে না। Mass Line Media Centre (MMC) ১৯৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আগত ৪৭ জন ইউপি মহিলা সদস্যদের জন্য এক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ৪৭ জন মহিলা সদস্য ও ৩৬ জন ইউপি চেয়ারম্যানের মতামত তাৎক্ষণিকভাবে জরীপ করে। জরীপে দেখা যায়, তাদের (৪৭) মধ্যে বেশী সংখ্যকই (৬৯%) ৬ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ, মাত্র ৩% এর গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী রয়েছে এবং ৬% সম্পূর্ণ ভাবে অশিক্ষিত। মোট সংখ্যার বেশী সংখ্যাক (৮৬%) গৃহকত্রী, তাদের বাইরের চাকুরী জগতের সাথে আন্তঃক্রিয়া নেই বললেই চলে। মতামত জরীপে দেখা গেছে উক্ত ৪৭ জন ইউপি মহিলা সদস্যের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে ৬১% এর সামান্য ধারণা রয়েছে। ১৯% এর খুবই কম এবং ৬% এর কোন জ্ঞান নেই। ইউপির বিভিন্ন সভায় আলোচনায় সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে ৪৩% আলোচনায় অংশ নেন না বলে জানান। বাকীরা (৫৭%) অনিয়মিতভাবে মিটিং এ কখনও কখনও আলোচনায় অংশ নেন বলে জানান। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের তাত্বিক পরিসরে এ ধরনের বাস্তবতা নিঃসন্দেহে তাদের প্রান্তিক অবস্থানকেই নির্দেশ করছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলীর স্পষ্ট নির্দেশনা ও কর্তৃত্ব প্রদানসহ তাদের ভূমিকা ও

অংশগ্রহণকে গুরুত্ব বহ করে তোলার জন্য শুধু তাদের নয় ইউপি পর্যায়ে সকলের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক (Scencitization) শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন (সুলতান, ২০০১)। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নির্বাচিত নারীদের নিয়ে ১৯৯৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা তাদের এই প্রান্তিক অবস্থানের বিষয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ তাদের না জানিয়ে ঋণ প্রদান, কার্ড বিতরণ, ভাতা বিতরণ করে থাকেন। পরিষদের সভায় নারী সদস্যদের উপস্থিতিতে অফিসিয়েল সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় না। তাদেরকে ঘরের গৃহিনী হিসেবেই মূল্যায়ণ করা হয়, সহকর্মী হিসেবে নয়। জনসাধারণের কাছে দেয় নির্বাচনী ওয়াদা নারী নির্যাতন বন্ধ করা, নারী শিক্ষা প্রসার, যৌতুক প্রথারোধ, রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত, স্কুল তৈরী, বয়স্ক শিক্ষা, দুস্থ মহিলা ভাতা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, টিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ইত্যাদি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও প্রশ্নের সম্মুখীন। ১৭মে ৯৯ এর দৈনিক জনকণ্ঠে মহিলা আইনজীবী সমিতির তদন্তে ৪ জন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির ধর্ষণের ঘটনা জানা যায়। পুলিশ আসামীদের যথাসময়ে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু অপরাধীদের হুমকীর কারণে প্রতিনিধিগণ নির্বাচনী এলাকায় যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন প্রপঞ্চের উপর তাদের সন্তোষজনক ও পর্যাপ্ত অধিকারের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এ সকল প্রপঞ্চের উপর অধিকার প্রতিষ্টার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এমতাস্থায় বৃহত্তর সমাজ কাঠামোর ক্ষমতা-ভিত্তির উপর পার্থক্যমূলক অধিকারের স্থলে সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণই ক্ষমতায়নের প্রকৃত উপায় হতে পারে।

অন্যান্য সমস্যার চিত্র ঃ

প্রবন্ধটিতে উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হচ্ছে, তা হলো রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের ধারণায় নতুন মাত্রা সংযোজনের যে প্রত্যয় ছিল তা অনেকাংশেই অবাস্তব এবং অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিনিধিগণ মনে

করেন, তাদেরকে চেয়ারম্যান-মেম্বরগণ ঘরের গৃহিনীর মত মূল্যায়ন করেন, সহকর্মী হিসেবে নয়। পরিষদে তাদের যথার্থ ও কার্যকরী অংশ গ্রহণের পশ্চাতে এটিই হচ্ছে বড় অন্তরায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাদের অগোচরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ও অর্থ বিজড়িত বিষয়গুলি থেকে ছলে-বলে-কৌশলে (Manipulation) তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমন নজীর বিরল নয় যে, কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে তাদের সম্মতি না থাকলেও অনেকটা জোড় পূর্বক (Coerceievly) সম্মতি আদায় করা হয়। এছাড়া গবেষণা এলাকা ও উত্তরদাতাদের মতামত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আরো কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলের সর্বজনীন অনুশীলনের অভাব। পরিষদের নীতি নির্ধারণী এই ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু, দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ঐচ্ছিক কার্যাবলী ও উন্নয়ন প্রকল্প, প্রকল্পের বরাদ্দ ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞাত হবার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান মেম্বারগণ ম্যানুয়েল অনুশীলনে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ম্যানুয়েলের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ত্রুটি হলো পরিষদে মহিলা সদস্যদের নির্ধারিত দায়িত্ব ও ভূমিকার (allocation of business) সুস্পষ্ট দিক- নির্দেশনা দানের ব্যর্থতা। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা ও দায়িত্বের (role and respondibility) ম্যান্ডেট সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকলে দক্ষতা অর্জন বিঘ্নিত হয়। বিগত ৪ বছরে ম্যানুয়েল সংশোধন ও মহিলা সদস্যদের ভূমিকা নির্ধারণে কর্তৃপক্ষ সক্ষম হয়নি বলে চেয়ারম্যান ও তাদের দায়িত্ব বা ক্ষমতার আওতাধীন কোন কাজ আছে বলে মনে করেন না।

২. ইউপি চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। অনিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত সভাগুলি অনেক সময় রাতে কিংবা পরিষদের কার্যালয়ের বাইরে দূরে কোথাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিধায় ইউপি মহিলা সদস্যদের পক্ষে নিয়মিত সভায় যোগদান করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

৩. পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়মূলক প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ সম্পর্কে প্রতিনিধিদের সঠিক ও যথাযথ তথ্য প্রাপ্তির (right of information) উপায় না থাকায় প্রকল্পে কার্যকর অংশগ্রহণ সন্তোষজনক হয় না। বন্যা দুর্গত

এলাকায় ওয়ার্ড ভিত্তিক ভিজিএফ কার্ড বিতরণে মহিলা প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেয়া হলেও ভিজিডি, বয়স্কভাতা ও টেষ্ট রিলিফের কাজে তাদের অংশ গ্রহণ বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিনিধিগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে তেমন কোন সদুত্তর পান না। পরিষদের বাৎসরিক বরাদ্দ বা বাজেট সম্পর্কে ইউপি মহিলা সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া হলে সকলেই (১০০%) এ ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য জানেন না বলে জানিয়েছেন।

৪. মহিলা প্রতিনিধিগণ পরিষদ থেকে যৎসামান্য ভাতা অনিয়মিতভাবে পেয়ে থাকেন। প্রতিনিধিদের অধিকাংশেরই নিজস্ব আয়ের কোন উৎস নেই। তাই পরিষদের কর্মকান্ডের জন্য ভাতার টাকা তাদের নিকট অতি মূল্যবান। এছাড়া নির্বাচনী এলাকায় পুরুষ সদস্য ও তাদের ভূমিকার অনুপাত হচ্ছে ১ জন মহিল ঃ ৩ জন পুরুষ (১ঃ৩)। ফলে একজন মহিলা প্রতিনিধিকে এককভাবে তার নির্বাচনী এলাকার তিনজনের ভুমিকা পালন করতে হয়। নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ ও পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে যাতায়াত ব্যয় প্রাপ্ত ভাতা থেকে যেমন সংকুলান কষ্টসাধ্য হয়, অন্যদিকে নিজস্ব আয় দ্বারা সংকুলানও সম্ভব হয় না। গবেষণায় নির্ধারিত তিনটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের পরিবারের মাসিক আয় বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে তাদের প্রায় সকলেই (১০০%) নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ অবস্থায় পরিষদের কাজের ব্যয় পরিবার থেকে সংকুলান করা কোন ক্রমে যৌক্তিক হতে পারে না। ফলে অঙ্গীকার এবং তা পূরণের নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক দুরবস্থা এবং অপর্যাপ্ত সম্মানী পরিষদের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়তার পথে প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে থাকে।

৫. পরিষদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের পথে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হলো চেয়ারম্যান এবং তার অফিস। চেয়ারম্যান তথ্য গোপন করেন। বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থেকে ইস্যুকৃত গুরুত্বপূর্ণ চিঠির তথ্য হয় অনবহিত রাখেন অথবা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেন। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অনেক সময়ে ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেন না, কিংবা করলেও অনেক বিলম্বে তা করে থাকেন এবং কোটা অনুযায়ী প্রকল্প

কার্যক্রম তাদের মাঝে যথাযথভাবে বন্টন হয় না বলেও মহিলা প্রতিনিধিগণ (৯ জন) অভিযোগ করেছেন। প্রতিনিধিদের প্রকল্প কমিটিতে সভাপতির নির্ধারিত কোটা কখনই পূরণ করা হয় না। ন্যূনতম যে কমিটিতে করা হয় সেগুলির কার্যক্রমও বিভিন্ন অজুহাতে পুরুষ সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান সম্পন্ন করেন। অনেক ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধিদের স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্য তার পক্ষে পরিষদের কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতা চর্চায় অংশ নিয়ে থাকেন।

৬. নির্বাচিত গবেষণা এলাকায় পরিলক্ষিত একটি মারাত্মক সমস্যা হলো ওয়ার্ডগুলোতে নারী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে আন্তঃকলহ, ঈর্ষা ও দ্বান্দ্বিক মনোভাব। ইউনিয়ন পরিষদের বেশীরভাগ কাজের পরিকল্পনা ওয়ার্ড ভিত্তিক হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই ওয়ার্ডগুলোতে পুরুষ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য এখনও বজায় রয়েছে। সংখ্যায় লঘিষ্ঠ মহিলা প্রতিনিধিদের ওয়ার্ডের কর্মকান্ডে ব্যাপক ও সাবলীল অংশ গ্রহণ ও প্রাধান্য পুরূষ সদস্যগণ স্বতঃস্ফুর্তভাব মেনে নেন না। তারা প্রতিপক্ষসুলভ আচরণ করেন। ফলে, পরিষদের চৌহদ্দীতে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মাঝে সহযোগিতার ভাবধারা ও মূল্যবোধ ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় মহিলা প্রতিনিধিগণ মাঠ পর্যায়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছেন না।

৭. দলীয়করণ ও শ্রেণীস্বার্থ চর্চার অবাধ প্রতিযোগিতা মহিলা প্রতিনিধিদের পরিষদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। পরিষদ পর্যায়ে চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সমর্থকরূপে কাজ করে। ফলে পরিষদের কার্যক্রম বিশেষতঃ আর্থিক সুযোগ সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বগোত্রীয়দের চেয়ারম্যান তার সমর্থন ভিত্তি (Support base) শক্তিশালী করণের জন্য অগ্রাধিকার (top priority) দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে মহিলাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কখনোই আশানুরুপ হয় না। কাঠামোগত কারণে চেয়ারম্যানের সাথে তাদের কার্যগত (functional) এবং ব্যাক্তগত আন্তঃক্রিয়াও সন্তোষজনক নয়। পরিণতিতে পরিষদের উন্নয়নে তারা অতি গুরুত্বহীন একটি পদের আলংকারিক প্রতিনিধিত্বই করে যাচ্ছেন।

৮. প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি মহিলা প্রতিনিধিদের সক্রিয় ও গঠনমূলক তৎপরতাকে সীমিত করে দিচ্ছে। পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় যে তথ্য পাওয়া গেছে তা আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বটে। প্রতিনিধিগণ জানান যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চেয়ারম্যান তার সমর্থক গোষ্ঠির সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদের সভা আহবান করেন। ফলতঃ মহিলা প্রতিনিধিগণ নিজস্ব এজেন্ডা উথাপন ও আলোচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এতে করে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়েছে এবং কাজ-কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা হারাচ্ছেন।

৯. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও অনুন্নত অবকাঠামো মহিলা প্রতিনিধিদের সীমিত অংশগ্রহণের জন্য বহুলাংশে দায়ী। প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও অরক্ষিত গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা মহিলাদের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন মহলের ব্যঙ্গ, কটূক্তি ছাড়াও তারা শারীরিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মুখোমুখী হচ্ছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর তারই সত্যতা বহন করছে। ১৭মে, ১৯৯৯ ইং তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরে মহিলা আইনজীবী সমিতির তদন্তে ৪ জন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির ধর্ষণের ঘটনা জানা যায়। খবরে বলা হয়, অপরাধীদের গ্রেফতার কিংবা শাস্তি প্রদানে পুলিশ প্রশাসন নীরব এবং অন্যদিকে হুমকির ভয়ে প্রতিনিধিগণ গৃহবন্ধীদশা ভোগ করছেন। সুষ্ঠু নিরাপত্তা অপ্রতুলতার কারণে পরিষদের রাত্রীকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সালিশ দরবারে তারা অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখান না। এছাড়া গ্রামের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দূরুত্ব মহিলা সদস্যদের পরিষদের কর্মকান্ডে নিয়মিত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণকে সংকুচিত করছে। দূরবর্তী স্থানে অনুষ্ঠিত কোন সভা বা সালিশ দরবারে যোগদানের জন্য কোন আলাদা ভাতার ব্যবস্থা না থাকায় তারা যে সকল অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। ১৯৯৬ সালে মহিলা সদস্যদের উপর পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের সভায় যোগদান করেন এমন সদস্যদের শতকরা ৮০ ভাগই পরিষদের কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা।

সুপারিশ ঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামোয় ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর নেতৃত্ব এখনও নিরঙ্কুশ অবস্থানে রয়েছে। ফলে গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সহকর্মী হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাকে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যানদের মাঝে এক ধরনের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। তথাপিও মহিলা প্রতিনিধিদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ফলশ্রুতিতে প্রথমদিককার দূরুত্ব দ্বন্দ্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে আরো তরান্বিত করতে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ সমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. ইউনিয়ন পরিষদের কাযক্রমে মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ম্যান্ডেট সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ ম্যানুয়েল অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সে সম্পর্কে ওরিয়েনটেশনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ।

২. ইউপি পর্যায়ে সকল প্রকার কার্ড যেমন-ভিজি এফ, ভিজিডি ইত্যাদি বিতরণ প্রসঙ্গে মহিলা সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পে সন্তোষজনক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সেগুলোর আর্থিক বরাদ্দের সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত প্রজ্ঞাপন তাদের নামে ইস্যুকরণের ব্যবস্থা করণ;

৩. থানা উন্নয়ন পরিষদের সভায় প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে একজন করে নারী সদস্যের চক্রাকার নিশ্চিত করন ।

৪. প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে পুরুষ সদস্যদের সংবেদনশীল করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ ।

৫. সালিশ ও গ্রাম আদালত কার্যক্রমে নারী সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের ভাষায় তাদের কে মনোনীত সদস্যরূপে বিবেচনা না করে নিজস্ব এজেন্ডা উপস্থাপন, আলোচনা ও কার্যকর মতামত দেবার সুযোগ সৃষ্টি করন ;

৬. মাসিক যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাসহ সম্মানী বৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিষদের কর্মকান্ডে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ ;

৭. পরিষদে সরকারি নির্দেশমালা ও সার্কুলার অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে কিনা তা মনিটর করণ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য গোপনের প্রবনতা পরীবিক্ষন ও হ্রাসকরণ ;

৮. পরিষদের মাসিক সভাসহ বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ সভা শেষে পড়ে শুনানোর অভ্যাস ও চর্চা গড়ে তোলা এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ না জেনে স্বাক্ষর করার বর্তমান রীতির পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৯. স্থানীয় পর্যায় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি কল্পে ইউপি সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র থাকবে, যেখানে স্থানীয় ভাবে কেবল তাদের অংশগ্রহণ নির্ধারিত থাকবে । তবে এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র নারী নির্যাতন, পরিবার পরিকল্পনা কিংবা টিকাদান কর্মসূচিতে তারা অংশগ্রহণ করবে বরং গোটা কর্মসূচিতেই তাদের অংশীদারীত্বমূলক সক্রিয়তা থাকবে। গবেষণায় দেখা গেছে রাস্তা নির্মাণ (১৫% অংশগ্রহণ), রাস্তা মেরামত (১৩.৮% অংশ গ্রহণ), নলকুপের স্থান নির্ধারণ (১২.৫% অংশ গ্রহণ) ইত্যাদি প্রকল্প তাদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়। এ সকল জনগুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সুষম অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐক্যমত সবার্গ্রে স্থির হওয়া প্রয়োজন ।

১০. দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা, জ্ঞান, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অধিকার নিশ্চিতকরণের কার্যকর উপায় গ্রহণের মাধ্যমে নারী পুরুষের পারস্পারিক সর্ম্পকের চিরায়ত বৈষম্য ও অধস্তন সর্ম্পক দুর করার পদক্ষেপ গ্রহণ ;

১১. সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ফলপ্রসু কৌশল (effective mechanism) বিদ্যমান সমাজ সংস্কৃতির অনুকুলে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আশু প্রয়োজন। অথবা এমন পলিসি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রবর্তন প্রয়োজন, যাতে সামজিক ক্ষমতা কাঠামো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনুগত হতে বাধ্য হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, সামাজিক মানুষের বৈষয়িক কর্মসম্পাদন (physical

perfomance) ও তার নিয়ন্ত্রক নিয়ামক হিসেবে ভৌত ও সাংগঠনিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মেক্যানিজমের (physical perfomance) উপর যতটা গুরুত্ব রাষ্ট ও সমাজ দিয়ে থাকে ব্যক্তির চেতনার (spirit) উন্নয়নের জন্য নৈতিক ও অ-বস্তবাদী তথা আধ্যাত্মিক (moral and spiritual) সংহিতার চর্চা বৃদ্ধির জন্য অনুকূল কোন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ নীতিমালা ও তার বাস্তবায়নকে ততটাই উপেক্ষা করা হয়। ফলে মানুষের জ্ঞান ও অবধারন প্রক্রিয়া (cognitive process) আচ্ছাদিত হয়েছে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, মনগড়া কুসংস্কার, ধর্মীয় যুক্তিবাদীতার অপব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্খলিত নৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে । চারজন ইউপি সদস্যার ধর্ষণের ঘটনা (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ মে ১৯৯৯) এই সমূদয় ঘটনা প্রবাহের একটির সাক্ষ্য দিচ্ছে । তাই সামাজিক নিরাপত্তা এবং মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনে যে কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাকানিজম বিনির্মাণের চেয়ে মানুষের মনোজগতের চিন্তন প্রক্রিয়ায় নব জাগরণ ও পরিবর্তন পুর্বাহ্নে প্রয়োজন। এইজন্য আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোয় এবং প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দীর্ঘমেয়াদী ও সঠিক ধর্মীয় নৈতিক নির্দেশনা সম্বলিত কোড (Moral code of religion) বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২. জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত ইউপি মহিলা সদস্যদের উপর আরোপিত ভূমিকা ও কর্ম বণ্টন (role and allocation of business) সম্পর্কে বাস্তব সম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করণ। বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুতে কেবল মাত্র নারীদের নয় বরং জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্ম অনুভবনশীলতা (Sensitizan and sensitivity) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কেননা প্রশিক্ষণ অবশ্যই কোন নতুন ইস্যু বা বিষয়ে দক্ষতা সৃষ্টি ও তা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের জন্য "Participatory Experimental Learning Process Ges Life Methods and Materials" জাতীয় আর সহায়তা ধর্মীর গোষ্ঠির প্রশিক্ষণ (Self Help Group Training) কার্যকর হতে পারে (Saha, 1999)।

১৩. আর্থিক স্বচ্ছলতা ক্ষমতা চর্চার অন্যতম ভিত্তি। গবেষণায় নির্বাচিত ইউপি সদস্যদের নিজস্ব কোন আয়ের উৎস নেই। সদস্যরা পরিষদ থেকে

নির্ধারিত মাসিক ভাতা অনিয়মিতভাবে পেয়ে থাকেন। তাছাড়া গবেষণায় নির্বাচিত ইউপি সদস্যা স্বামীদের মাসিক আয় অনুশীলনে দেখা গেছে তাদের মাসিক আয়ের গড় মাত্র ২৫.০০/-। অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে সকল নারী ইউপিতে কিছুটা ক্ষমতা চর্চা করতে পারছে তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল (সুলতানা, ২০০১)। গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার পিছনে কারণ মূলত দুইটি।

১. চাকুরী বাজারে (Job market) চাকুরী প্রাপ্তির সুযোগ কম এবং

২. পার্থক্য মূলক ও স্বল্প মজুরির হার।

দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের মজুরির একটি ভগ্নাংশ (Fraction) তারা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে পার্থক্য মূলক মজুরীর হারের ক্ষেত্রে পুরুষরা যে মজুরি পায় তার ৪৬% পায় মহিলারা (Hamid,1996)। এর পেছনে মহিলাদের দক্ষতার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির অভাব, আনুষ্ঠানিক চাকুরীর (formal job market) জন্য দক্ষতার নিম্ন স্তর, দরকষাকষির ক্ষমতার অভাব এবং পারিবারিক ভূমিকা ইত্যাদি দায়ী। এ অবস্থায় তাদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানের পরিধি ও নিরাপত্তা বিস্তৃত করার সাথে সাথে বৈষম্য মূলক মজুরী হারের পরিবর্তন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর ঋণ দানের প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সর্বোপরি, মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, উন্নয়নশীল সম্পদে অধিকার, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, বৈধ আইন কাঠামো সৃষ্টি ও আইনের কার্যগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

১৪. সমাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা বৃদ্ধি অতি জরুরী। শুধু ইউপি মহিলা সদস্যদের মধ্যেই নয়, বরং সর্বস্তরের সকল মানুষের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাব্যতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শক্তিশালী মহিলা উইং গঠন করতঃ এ ব্যাপারে তাদের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে সচেতনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করা সম্ভব। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে মহিলাগণ সামাজিক কাঠামোয় তাদের অধস্তন অবস্থান এবং এজন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে

এবং মৌলিক অধিকার আদায়ে দাবী-দাওয়া উত্থাপন করার, আলোচনা করার মত যৌক্তিক বুদ্ধি অর্জন করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতি এখনও বৃহত্তর সমাজ কাঠামোয় অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। কেননা, সামাজিক বিভিন্ন শক্তিগুলি (Forces) যেমন-সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, মূল্যবোধ ব্যবস্থা, নের্তৃত্বের প্যাটার্ণ, কর্তৃত্ব কাঠামো, নেতৃত্বের আন্তঃব্যক্তিক সর্ম্পক, যুক্তিবাদীতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকৃতি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর নিয়ামক (Phenomena) গুলির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। পিতৃতান্ত্রিক প্রথানুগত রক্ষণশীল ধাঁচের সমাজ কাঠামোতে তাই রাষ্ট্রীয় নীতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, হয় কথিত সমাজ মূল্যমানের সমান্তরাল ধারায় প্রযুক্ত করে সম্ভব, নতুবা আমূল সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ামক নিয়ন্ত্রণে ততোধিক শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম ও কৌশল (Institutional mechanism and strategy) প্রয়োগে তা সম্ভব হতে পারে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার প্রতিকারে তাই প্রয়োজন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রহণযোগ্য পলিসি ও প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ নতুবা বিদ্যমান মূল্যবোধ ও নেতৃত্ব প্যাটার্নের আমূল সংস্কার ও কর্তৃত্ব কাঠামো নিয়ন্ত্রণে বিকেন্দ্রীভূত শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল প্রবর্তন, যেখানে মহিলা সদস্যাদের আর্থিক সয়ম্ভরতার উপায়ও সুনিশ্চিত থাকবে। অবশ্য এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজমের কার্যকারীতা বহুলাংশে নির্ভর করে ব্যক্তির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে –"Interaction between social system and individual where both predisposion for and skills relating to participation in the political sphere is internalized" (Salahuddin, ১৯৯৫)। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত সামাজিকীকরণ ও মতাদর্শ প্রবিষ্ট করণ প্রক্রিয়ায় (Socialisation and indoctrination) সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা (Gender inequality) বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক নারীর মনোভাব ও ঝোঁক (Attitude and aptitude) গড়ে উঠে মূলতঃ ঐ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায়।

গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় একজন নারী যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বেড়ে উঠেছে, সেখানে সে আশৈশব প্রত্যক্ষ করেছে তার লিঙ্গ ভিত্তিক আরোপিত কর্ম ও ভূমিকা (Assigned sex role and responsibility) এবং তা সমর্থিত হয়েছে তার পরিবেশ ও পুরুষ সহযোগী দ্বারা। ফলে রাজনীতি সম্পর্কে একধরনের প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠেছে তার এবং তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে। ফলশ্রুতিতে, রাজনৈতিক সচেতনতা ও কার্যকর অংশগ্রহণের ধারণা বিপন্ন হয়েছে। তাই যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজমের ফলপ্রসূতা নির্ভর করছে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর।

তথ্য নির্দেশিকা

Ahmed Shafi, Bela Nabi and et. al (2000), ***"One Decade of Bangladesh Under Women Leadership",*** Unnayan Padokkhep, vol.5 No.4, Steps Towards Development, Dhaka

Chowdhury, Nazma (1994), ***"Women in politics",*** Empowermentm, Women for women, Dhaka.

Duza, Asfia, and Hamida Begum (1993), ***"Emerging New Aceents-A perspective of Gender and Development in Bangladesh",*** Women for Women, Dhaka.

GOB 1997: ***"The Local Government (Union Parishad, 2nd Amendment) Act 1997"*** Bangladesh Gazete Additional paper, 8th September.

Guhathakurta, Meghna, and Suraiya Begum (1995), "Political Emopoerment and Women's

Movement", ***Empowerment of Women Narobi to Beijing (1985-95)",*** eddited by Women for Women, Dhaka.

Griffen. V 1987 (ed.) ***"Women, Development and Empowerment,"*** APDC, Kuala Lampur, Malaysia

Huq, Jahanara (1995), ***"Empowement of women in Bangladesh, Empowerment of Women Nairobi to Beijing (1985-1995)",*** eddited by Women for Women, Dhaka.

Hamid, Shamim (1996), ***"Why Women Count",*** University press Limited, Dhaka.

Qadir, Sayeda Rowshon (1994), ***"Participation of Women at Local Level politics: Problems and prospects",*** editted by Nazma and et, al., Women and politics, Women for Women, Dhaka.

Saha, Tapati (1999), ***"Training for Empowement",*** Unnayan Podokkep, Vol. 5, No.2, Steps Towards Development, Dhaka.

Salauddin, Khaleda (1995), ***"Women's political Participation: Bangladesh",*** eddited by Jahanara Huq and Others, ***Women in politics in Bangladesh***, Women for Women, Dhaka.

Siddiqui, Nazma (1996), ***"Feminization of poverty: Conceptualization, Evidence and A Feminist Critique"*** Women for Women, Dhaka.

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ই মে, ১৯৯৯।

সুলতানা, আবিদা (২০০১), ***"ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা ঃ একটি বিশ্লেষন",*** লোক প্রশাসন সাময়িকী, সপ্তদশ সংখ্যা, সাভার, ঢাকা।

স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব জরীপ, বিবিএস, ১৯৯৭

রহমান, শাহীন (১৯৯৭), ***"জেন্ডার পরিভাষা কোষ",*** উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা জানু-মার্চ, ঢাকা।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল। এতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ নবীন লেখকদের বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত লেখাসমূহ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে লেখা/প্রবন্ধ সাময়িকীতে প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

♦ প্রবন্ধ অবশ্যই স্বরচিত ও মৌলিক হতে হবে এবং অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রহণ করা হবে না। প্রেরিত লেখার সাথে এই মর্মে লেখককে একটি বিবৃতি দিতে হবে।

♦ প্রবন্ধ সাদা কাগজের (A4 Size) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে মুনীর কী বোর্ডে প্রশিকা ফ্রন্টে টাইপকৃত (কম্পিউটার কম্পোজ) হতে হবে। মূল কপিসহ পান্ডুলিপি ২ কপি ও Diskette জমা দিতে হবে।

♦ প্রবন্ধের উপরে আলাদা কাগজে প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজী শিরোনামসহ লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের অন্য কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

♦ প্রতিটি পান্ডুলিপির সাথে অবশ্যই অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে ইংরেজীতে একটি নির্যাস (Abstract) থাকতে হবে।

♦ প্রবন্ধে পাদটীকা, তথ্য নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রমিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। লোকপ্রশাসন সাময়িকীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয় ঃ

বই ঃ Siddiqui, Kamal (1996) ***Towards good governmence in Bangladesh.*** Dhaka : UPL.

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৯৬) *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র ঃ স্বরূপ ও সমাধান।* ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী।

জার্ণাল ঃ Khan, Abar Ali (1980), ***Decentralization for rural development in Bangladesh.*** *Bangladesh Journal of Pblic Administration* 3(1) : 1-40.

রহমান, মোঃ হাসিবুর (১৯৯৮) *প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ঃ কতিপয় কৌশল। লোকপ্রশাসন সাময়িকী।* ১২ ঃ ১২৯-১৩৭।

♦ পান্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

♦ মনোনীত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখককে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার জন্য ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

♦